চার ডাক্তার

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

=>হাতুড়ে
=>হোমিওপ্যাথ
=>অ্যালোপ্যাথ
=>ডাক্তার, বিশেষণহীন

শুরুর আগে

পিতামহর মুখে প্রায়ই শুনতাম ‘শরীরম ব্যাধিমন্দিরম’। আবার একটা প্রবচন ও শোনা যেত—’শতংমারি ভবেৎ বৈদ্য’। মানে—শ’খানেক মানুষ না মারলে বৈদ্য হওয়া যায় না। আবার এও শুনতাম, ডাক্তাররা হলেন জ্যান্ত ভগবান। বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাধি ও বৈদ্য সম্পর্কিত বোধের মধ্যে একটা জটিলতা ছিল। ব্যাধিমুক্তি ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য এই জটিলতাকে আরও বাড়িয়েছে।

উপন্যাস সামাজিক নিবন্ধ নয়, কিন্তু সামাজিক সমাজ তো উঠে আসে বিভিন্ন চরিত্রের আশ্রয়ে। বিভিন্ন সময়ে লেখা চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিষয়ক চারটি আখ্যান একত্র করে এক মলাটে রাখা হল। চারটি আলাদা আখ্যান হলেও সচেতন পাঠক এর মধ্যে যোগসূত্র খুজে পাবেন। এরকম নতুন ধরনের একটি উপন্যাস প্রকাশ করলেন বলে পত্রভারতীকে ধন্যবাদ জানাই।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

হাতুড়ে

পিতৃসত্তা

তারাপীঠে স্পেশাল লাইন দিলে আগে পুজো দেওয়া যায়। সেই লাইন কিনতে হয়। একশো টাকার আছে, দুশো টাকার আছে...। যত বেশি টাকার লাইন, ভিড় তত কম।

ডাক্তার ভজন মৃধা সপরিবারে পুজো দিয়ে বেরুল। সবার কপালেই সিঁদুরের টিপ। ওরা চারজনই তারা মায়ের বডি টাচ করতে পেরেছে। পাণ্ডাকে খুশি হয়ে কিছু বেশিই দিল। ওরা ভিআইপি লাইনের টিকিট কিনেছিল।

তারা মায়ের কাছে মানসিক আছে ভজন ডাক্তারের। মায়ের কাছে প্রার্থনা আছে। না-চাইতেই অনেক দিয়েছেন মা। বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ, পয়সাকড়ি সবই দিয়েছেন। একটা ভালো জামাই দিয়েছেন, মদ খায় না। বউ-অন্ত প্রাণ। একটা খুব ভালো কম্পাউন্ডার দিয়েছেন, মোটে কামাই করে না। রুগিপত্র মোটামুটি ভালোই হচ্ছে। একটা ওষুধের দোকান করেছে। সবই মা নিজের ইচ্ছেয় দিয়েছেন। একটাই আশীর্বাদ শুধু মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেবে ভজন ডাক্তার। সেটা চাইতেই এখানে আসা।

চেয়েছে। মায়ের গায়ে হাত দিয়ে চেয়েছে ভজন ডাক্তার। ডাক্তারের স্ত্রী রেবতী, ছেলে সুবোধ, মেয়ে অপর্ণা সবাই মিলেই মায়ের কাছে মনোবাঞ্ছার কথা জানিয়েছে। আজ অমাবস্যা। মা আজ বেশি পাওয়ারফুল। গতকাল নিরামিষ খেয়েছে সবাই। আজ সকালে স্নান সেরে নতুন কাপড়-জামা পরে সবাই মন্দিরে এসেছে। পুজো-টুজো হল, এবার খাওয়া দাওয়া। এখন মাংস-টাংস খেতে কোনো বাধা নেই।

২

ভজন মৃধা পাশ করা ডাক্তার নয়। ভজন ডাক্তারি শিখেছে ওর বাবার কাছে। ভজনের বাবার নাম বিলাস মৃধা। বিলাসের বড় বিচিত্র জীবন। বিলাসের জীবন-কথা যদি লিখতে পারত ভজন, একটা উপন্যাস হয়ে যেত।

ওর বাবা চাকরি করত একটা মর্গে। মর্গের ডোম নয়, স্টোরকিপার ধরনের কাজ। মৃতদেহ ভেজাবার ফর্মালিন, দুর্গন্ধ তাড়াবার ব্লিচিং পাউডার, সাবান, বস্তা এসব সহ মৃতদেহের স্টক রাখতে হত। বেওয়ারিশ মৃতদেহগুলো মাটি চাপা দিয়ে দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু ডোমেরা ওইগুলো খুচরো বিক্রি করত। পেট কেটে কিডনি, প্যাংক্রিয়াস, লিভার, স্পিলিন। বুক কেটে ফুসফুস, হার্ট এসব বার করে নিয়ে ফর্মালিনে ভিজিয়ে রাখত। আর ওইসব পার্টসগুলো ডাক্তারদের বিক্রি করে দিত।

মেডিকেল কলেজে এর একটা বাজার ছিল। এ ব্যবসাটা ডোমরাই করত মূলত, কিন্তু বিলাস মৃধাকে এড়িয়ে ওই কাজ করা যেত না। বিলাস আস্তে আস্তে বিজনেসে জড়িয়ে গিয়েছিল। হাতেকলমে কাজ শিখে ফেলেছিল। অন্যের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পেটে হাত ঢুকিয়ে কচাৎ করে গলব্লাডারসহ লিভারটা কেটে বার করে আনত। বিলাসের ডিসেকশনের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো সন্তোষ ডোমের আন্ডারে মর্গেই হয়েছিল। এবং সত্যি বলতে কী, সত্যিকারের এমবিবিএস পাশ ডাক্তাররাও এতগুলো ডিসেকশন ক্লাস পায়নি। বিলাস হালকা করে কঙ্কালের বিজনেসের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিল। কঙ্কালের প্রসেসিংটা মর্গে হত না। সন্তোষ ডোম ওর বাড়িতে নিয়ে যেত। মাটি চাপা দিত। কিছুদিন পর মাটি খুঁড়ে চুন, কস্টিক সোডা মেশানো বালি চাপা দিয়ে আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিত। তারপর পরিষ্কার-টরিষ্কার করে কঙ্কাল তৈরি হত। কাজটা ঝামেলার। এক পিস, দু-পিস-এ ঠিক পোষায় না। তাই জন্য সন্তোষ বডি বেচে দিত। বাদু থেকে একটা লোক আসত, সে বস্তা পেঁচিয়ে বডি নিয়ে যেত। তার বড় কারবার। সে কবর-টবর থেকেও মাল তুলত। বিলাসের সঙ্গে আরজিকর-এর ছাত্রদের ভাবসাব ছিল। কঙ্কাল, খুলি, এসবে ওদের কাছ থেকে কমিশন পেত বিলাস। বিলাস প্যাটিলা, আলনা,

ইলিয়াম, কারপাস-এসব অ্যানাটমির কথাবার্তা ডাক্তারি ছাত্রদের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে পারত। এ-লাইনে ওর বেশ নাম হয়ে গিয়েছিল।

অঙ্গপ্রতঙ্গের কিছু আদরসূচক ডাক নাম ছিল। আদরে শেষে একটা 'উ' যুক্ত হয়। নব যেমন নবু, রতন যেমন রতু, তেমনি প্যাংক্রিয়াসকে প্যাংকু, লিভারকে লালু, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে পুটু বলে ডাকা হত। এটাকে সাংকেতিক ভাষাও বলা যেতে পারে। এ ছাড়া হাড়গোড়গুলোর কিছু নিজস্ব নাম ছিল সন্তোষ ডোমের—যেমন তেকোনা (পেলভিক বোন), পাঞ্জা, বড় কাঠি, চাক্কি এসব। এই সাংকেতিক ভাষা ওরাই বুঝত, আপনি, আমি বুঝব না।

দিনেরবেলা এই কাজ। রাতে তেমন কাজ ছিল না বিলাসের। একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয় ওর। ওই ডাক্তারকে এক সময় মাল সাপ্লাই দিয়েছিল বিলাস। ওই ডাক্তার চেম্বার দিয়েছিল বারাসতে। বিলাস ওখানে চেম্বার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে লাগল। বিলাসের বয়েস তখন চল্লিশ পেরোয়নি। ওই চেম্বারের রুগির নাম ডাকা দিয়ে নতুন কেরিয়ার শুরু। তারপর নানা কাজ শিখেছে চেম্বারে। ইনজেকশন দেওয়া, রক্ত টানা, ব্লাডপ্রেশার মাপা এই সবকিছু শিখে গেল। ব্যান্ডেজ বাঁধা, টুকটাক সেলাই করাও শিখে গেল। আগে মৃত শরীর সেলাই করতে পারত। পার্টস হাতিয়ে নেওয়ার পর বডিটা হাঁ করে রাখা চলত না। কিন্তু সে সেলাই যেমন তেমন করে দিলেই চলত। কারণ, মৃতদের ব্যথা লাগে না। জ্যান্তদের ব্যথা লাগে। জ্যান্ত বডিতে কেটে গেলে সেলাই-টেলাই করার সময় হাত-টাত টেনে ধরত বিলাস। তারপর আস্তে আস্তে টুকটাক সেলাই করাও শিখে গেল। শেখার ইচ্ছেটাই আসল। বিলাসের কাজ শেখার প্রবল ইচ্ছে ছিল।

দেশ ক্রমশ এগোচ্ছিল। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গর্ভপাতও বাড়তে লাগল। দেশ যখন পিছিয়ে ছিল, তখন কুমারীরা গর্ভসঞ্চার হলে আত্মহত্যা করে ফেলত। পরবর্তীকালে আত্মহত্যা করার দরকার হয় না। গর্ভপাত করে নিত। দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওই চেম্বারটিও নার্সিংহোমে উন্নীত হল। বিলাস

মৃধা ওই নার্সিংহোমেও কাজ শিখতে লাগল। গর্ভপাতের কাজ। বিলাস দেখল ভ্যাকুয়াম অ্যান্ড সাকশন মেশিন, দেখল কিউরেটিং মেশিন—যে মেশিনটার যান্ত্রিক হাত জরায়ুর ভিতর ঢুকে গিয়ে কচি ভ্রূণ কুরে কুরে কাটে। ভালো কথায় যা স্যালাইন ওয়াটার, আসলে নুন জল, সেটা ইনজেকশন করে দিলেও ভ্রূণ নিধন হয়। এরকম অনেক কায়দা শিখে গেল বিলাস। সভ্যতার আরও উন্নতির ফলে এখন ভালো ওষুধ বেরিয়ে গেছে, যা পরে খেয়ে নিলেও চলে। ফলে ওই কায়দার গর্ভপাত এখন কিছুটা কমেছে, তবে যে সময়ের কথা বলছি, তখন গর্ভপাত বেশ চালু ছিল। দেয়াল, রেলের কামরা, লাইটপোস্ট পোস্টারে ভরা থাকত—'ঋতুবন্ধ? চিন্তা কী? পাঁচ মিনিটেই মুক্ত।'

বিলাসের গ্রামে হাট বসে। দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওটা বাজারে উন্নীত হল। ওর গ্রামের নাম শুঁটিয়া। বারাসত থেকে বনগাঁর দিকে বারাসতের পরের স্টেশন বামনগাছি থেকে চার কিলোমিটার ভিতরে এই গ্রাম। এখান থেকেই যাতায়াত করত বিলাস। এই এলাকায় কোনও ডাক্তার ছিল না। বিলাস তার পাশের বাড়ির এক পেট ডিং ডিং কিশোরকে কৃমির ওষুধ খাইয়ে কৃমি বের করে দিয়ে ওর পেটের অবস্থা স্বাভাবিক করে দেয়। কিছুদিন পর এক মৃত প্রায় কলেরার রুগিকে গ্লুকো-স্যালাইন চালিয়ে বাঁচিয়ে দেয়। এরপর ওর ডাক্তার হওয়া রোখা যায় না। ওকে ডাক্তার হতেই হয়। শুঁটিয়া বাজারে একটা টিনের ঘর ভাড়া নিল বিলাস, একটা টিনের পাতে লাল রং দিয়ে বাঁ-দিকে একটা লাল ক্রস চিহ্ন আঁকল, তারপর লিখল ডা. বিলাস চন্দ্র মৃধা। নিজের নামের পাশে ডা. শব্দটা বসিয়ে অনেকক্ষণ অবাক চোখে দেখেছিল বিলাস। আরও কিছুটা জায়গা ছিল ওই টিনের পাতে। ডাক্তারদের নামের পর ডিগ্রি লেখার নিয়ম। বিলাসের নামের পর ডানদিকের ধূসর শূন্যতা বড় চোখে লাগছিল বিলাসের। বিলাস রং-তুলি দিয়ে দিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় একটা স্টেথো এঁকেছিল। তখন বিলাসের বয়েস পঞ্চাশ প্রায়। ১৯৬৯ সাল। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেছে। বিলাস মৃধা নিজে স্বয়ম্ভর ডাক্তার। আশেপাশে কোনো পাস করা ডাক্তার নেই। বিলাসের ভালোই রুগিপত্র হতে লাগল। আগে কেউ

জল-হাজা, খোস-পাঁচড়া-দাদের চিকিৎসা করাত না। ওসব নিজে নিজেই মনুষ্যশরীরে জন্মাত, আবার সময় হলেই সেরে যেত। বিলাস পেট্রোলিয়াম জেলির মধ্যে বোরিক পাউডার আর স্যালিসাইলিক অ্যাসিড মিশিয়ে একটা মলম তৈরি করেছিল, সেটা আশ্চর্য কাজ করতে লাগল। সালফা গুয়াডিনিন আর মেকসাফর্ম-এর গুঁড়ো মিশিয়ে পুরিয়া করেছিল, পেটখারাপে দারুণ কাজ দিত। একবার একটা ঘটনা ঘটল। ভ্যানরিকশা করে একটা সাপে-কাটা রুগি নিয়ে হাজির হল কয়েকজন। রুগির গা কালচে হয়ে গেছে। মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে। জ্ঞানও নেই। বহুদূর থেকে এসেছে। দেখেই বুঝেছিল বিষাক্ত সাপ কেটেছে। বিলাস বলেছিল, এখানে কেন আনলেন? হাসপাতালে নিয়ে যান। ওরা বলেছিল, আমরা ভেবেছিলাম এখানে সাপে-কাটার স্পেশাল চিকিৎসা হয়। সাইনবোর্ডে সাপের ছবি আঁকা আছে কিনা। সাপের ছবিগুলো দেখাল আঙুল উঁচু করে। আসলে ওই বিলাসের আঁকা স্টেথোস্কোপের দিকে ওদের আঙুল। এরপরই স্টেথোর ছবি সাদা রং বুলিয়ে মুছে দেয় বিলাস। কিছুদিন পর একটা রুগি এসেছিল, প্রেশার পড়ে গেছে। নাড়ি প্রায় নেই। মুখে কোরামিন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল বিলাস। সেই লোক বেঁচে গেল। তারপর বিলাসকে দেখে কে! ওর নামের বোর্ডের সেই সাদা জায়গায় আবার লিখতে হল ধন্বন্তরি।

৩

ডা. বিলাস চন্দ্র মৃধা, ধন্বন্তরির ছেলে ভজন। ভজন মৃধা। এখন ডা. ভজন চন্দ্র মৃধা, এমডি। এই এমডি-র পর একটা ছোট্ট ব্র্যাকেটে আরও ছোট করে লেখা এএম। এএম মানে হল অলটারনেটিভ মেডিসিন। এই এমডি ডিগ্রিটা অনেক পরে হয়েছে। ডাক্তারি শাস্ত্রে ওর হাতেখড়ি ওর বাবার কাছেই। ভজনের বাবা বিলাস না হয় গ্রাম-জীবনে মর্গে কাজ করেছে, দেহ সম্পর্কে ওর ধারণা ছিল, তবে সেটা মৃতদেহ সম্পর্কে। কিন্তু ভজনের দেহ সম্পর্কে ধারণা জন্মে যায় ওর কৈশোরেই। নারীদেহ সম্পর্কে

ওর সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে যায় আঠারো বছর বয়সেই। শুধু শরীরের আকৃতি-প্রকৃতি নয়, নানাধরনের গুপ্তজ্ঞানও রপ্ত করেছিল ভজন। নারীদের ঋতুচক্র এবং কোন কোন দিন নিরাপদ এসব ও জেনে গিয়েছিল মেনকা হালদার নাম্নী এক প্রোষিতভর্তৃকার কাছে। মেনকার বয়স ছিল ভজনের চেয়ে বেশ বেশি। মেনকাই ওকে আহ্বান করেছিল প্রথমে। স্কুলে প্রায়শই যেত পারত না ভজন, যাওয়া হত না। পরীক্ষার 'টেস্ট'-এ অ্যাল্যাউ হল না। বিলাসের গোচরে আসে তার ছেলে স্কুলের পরিবর্তে কোথায় যায়। বাড়িতে প্রায় বন্ধ করে রাখল। বাড়ির ষোড়শী পরিচারিকা জোছনা গর্ভবতী হয়ে পড়ল। ডা. বিলাস মৃধা নিজ হাতেই গর্ভপাত করাল, কিন্তু গর্ভপাতকালে পুত্র ভজনকে একটি অভিনব শাস্তিপ্রদান করেছিল। বলেছিল, তোকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি। গর্ভপাতের পুরো প্রক্রিয়া চলার সময় সেই গুপ্তঘরে অয়েলক্লথের পাশে ভজনকে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। আসলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পিতা শাস্তি দেওয়ার ছলে পুত্রকে ট্রেনিং দিয়েছিল। এটা সেই উচিত শিক্ষা বলা যায়।

বাবার মেডিকেল কলেজেই ভরতি হয়ে গেল ভজন। বাবার সঙ্গেই বসতে লাগল।

ততদিনে চেম্বারের রূপ পালটে গেছে। রুগিদের অপেক্ষা করার জন্য চেয়ার, মাথার উপরে ফ্যান, ডাক্তারের ঘরের সামনে কাচের দরজা, এক্স-রে পেট দেখার আলো, আরও কত কী! বড় সাইনবোর্ড হয়েছে—ধন্বন্তরি মেডিকেল হল। এখানে আমাদের ভজন অ্যাপ্রেন্টিস। না, ডাক্তারি লাইনে অ্যাপ্রেন্টিস বলে না। ইনটার্নি।

ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ধোয়া দিয়ে কাজ শেখা শুরু হল। তখন ডিসপোসেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার হত না। ইথার দিয়ে সিরিঞ্জ ধুয়ে নিতে হত, সুচ মুছে নিতে হত। ইনজেকশন দেওয়াটাও শিখল। প্রেশার মাপা, নাড়ি দেখা, নারী দেখাও। যদিও এটা আগেই অনেকটা শেখা ছিল।

কিছু কিছু কাজ শেখার ঘটনা মনে পড়ে ভজন ডাক্তারের। তখন এরকম ডায়াবেটিস মাপার কাগজ বেরোয়নি। আজকাল পেচ্ছাপের মধ্যে কাগজ ডুবিয়ে রং দেখে সুগার লেভেল সহজে বোঝা যায়।

কোনো রুগি এলে যদি মনে হত সুগার আছে, তাকে একটা পাথরের বাটিতে পেচ্ছাপ করতে বলা হত। সেই বাটিটা বাইরের রোদ্দুরে ফেলে রাখা হত। পেচ্ছাপের জলটা উবে গেলে—সেই বাটিতে পিঁপড়ে আসে কিনা দেখা হত। মল পরীক্ষা নিজেই করতে পারত বিলাস। একটা কলাপাতায় মলটা ফেলে কাঠি দিয়ে নেড়ে দেখত কীরকম জীর্ণ হয়েছে। কৃমির অস্তিত্ব দেখত, আম আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করত। গন্ধও শুঁকত। গন্ধ শুঁকে আমের পরিমাণ বুঝতে পারত। এতে কোনো ঘেন্না ছিল না। থাকার কথাও নয়। কারণ, বিলাস ছিল মড়া-ঘাঁটা মানুষ। ভজন এতটা পারত না। মল পরীক্ষা-টরীক্ষা ওর দ্বারা হত না। তাছাড়া পরীক্ষা করে লাভ কী? পরবর্তীকালে কত প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি হয়েছে। ওখানে পার্টি পাঠালেই কমিশন পাওয়া যায়। যত পরীক্ষা, তত পয়সা। এখন আবার সিটি স্ক্যান, আলট্রাসোনো—এসব হয়েছে। ওখানে কমিশন অনেক বেশি। ওইসব কোম্পানিকে পেশেন্ট পাঠিয়েছিল ভজন ডাক্তার, কিন্তু কমিশন পায়নি। ওরা এইসব ডাক্তারদের পাত্তা দেয় না। না দিকগে যাক। ভজন ডাক্তারের দিব্যি চলে যাচ্ছে। রুগি কম নেই। শুঁটিয়া বাজারে গত চার বছর ধরে একটা ওষুধের দোকান একজন এমবিবিএস বসিয়েছে বটে, কিন্তু ভজন ডাক্তারের চেম্বারেই ভিড় বেশি। এখানে ফি হল কুড়ি টাকা মাত্র। কারুর কারুর কাছ থেকে আরও কম নেয় ভজন ডাক্তার। ভজনের বাবা পাঁচ টাকার বেশি কোনওদিন ফি নেয়নি। কথা হচ্ছিল কাজ শেখা নিয়ে। ভজনের বাবা বিলাস ডাক্তার রুগিকে শুইয়ে পা দুটো মুড়ে পেটের কাছে নিয়ে যেত, এতে রুগির বাতকর্ম হয়ে যেত। সেই বাতকর্মের গন্ধে বলত—গতকাল খুব আন্ডা খাওয়া হয়েছে বুঝি? এরকম আরও কত কথা মনে পড়ে ভজনের। কাচের গেলাসে পাশাপাশি রেখে তারা বুঝিয়েছে বিকোসুল খাওয়া পেচ্ছাপ আর জন্ডিসের পেচ্ছাপ। দুটোই হলুদ। বিকোসুল মানে ভিটামিন-বি সমন্বিত একটি ওষুধ। কিছুটা ওষুধ পেচ্ছাপের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এতে রং হলুদ হয়। আর জন্ডিস হলে পিত্তের কারণে রং হলুদ হয়। মদ খাওয়া বমি আর অ্যাসিডিটির বমির কধ্যে কী তফাত বুঝিয়েছিল বিলাস। গ্রামের বাড়িতে ইলেকট্রিকের লাইন

এসেছিল ১৯৮২ সালে। এর আগেই বাড়ি দোতলা হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে হ্যাজাক এবং ব্যাটারিচালিত আলো জ্বলত। ইলেকট্রিক কানেকশন আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যান, ফ্রিজ, একটি ১৪ ইঞ্চির সাদা-কালো টেলিভিশন সেট কেনা হয়েছিল। ফ্রিজটা ছিল বিলাসের খুব শখের। রাতে ঠান্ডা জল দিয়ে বাংলা খেত বিলাস। টাকাপয়সা হওয়ার পরও হুইস্কি বা বিলিতি মদ ধরেনি বিলাস মৃধা। বাংলাই। ফ্রিজটা এলে ঠান্ডা জলে। ভজনের মা ফ্রিজটা সকড়ি করতেন না। আগে সকড়ি-টকড়ি নিয়ে এত বাছবিচার ছিল না। বামুন-কায়েতরা খুব সকড়ি-টকড়ি মানে। টাকাপয়সা হওয়াতে বিলাসের বউও বেশি বেশি সকড়ি-টকড়ি মানতে লাগল। সন্ধেবেলা বেশি ধরে ধূপকাঠি এবং শাঁখের আওয়াজ ইত্যাদি। ফ্রিজে রাখা হত ফল, দই, মিষ্টি। আর জল। রান্না খাবার ফ্রিজে ঢুকত না।

একবার হয়েছিল কী, একটা লোক এসে একটা ভাঁড় দিয়ে গেল। মুখ বন্ধ। দড়ি দিয়ে বাঁধা। বলল, ডাক্তারবাবুকে দিয়ে দেবেন। বিলাসের স্ত্রী ভাঁড়টা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সন্ধের সময় ফ্রিজ খুলতেই একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। গন্ধের কারণটা বোঝা গেল না। রাত্রে বিলাস এসে ফ্রিজ খুলল যখন, তখন বিটকেল গন্ধ হয়ে গেছে। এমনকী জলেও গন্ধ ধরে গেছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেল গন্ধের উৎস হল ওই ভাঁড়। খুলে দেখা গেল ওর মধ্যে রয়েছে মনুষ্যমল। বিলাস হতবাক। বিলাসের স্ত্রী ওই ভাঁড়ের আগমন কাহিনি বলে। এরপর ব্যাপারটা কিছুটা বোধগম্য হয়। এক রুগিকে বলা হয়েছিল আপনার মল পরীক্ষা করতে হবে। নিয়ে আসবেন। ও নিয়ে এসেছিল। চেম্বারে বিলাসকে পায়নি, হয়তো কল-এ গিয়েছিল। লোকটা ভাঁড়টা নিয়ে এসে যদি বলে, ডাক্তারবাবুকে দিয়ে দেবেন, তাকে কী বোধগম্য হয়! কতজনই তো ভালো হয়ে গেলে ডাক্তারবাবুর জন্য দই-মিষ্টি নিয়ে আসে। কত লোকই তো বাড়ির লাউ-চালকুমড়ো নিয়ে আসে। সরল মনে ফ্রিজে ঢুকিয়ে ছিল বিলাসগিন্নি।

ম্যাট্রিকটা পাস দেওয়ার জন্য অনেক করে বলেছিল বিলাস, কিন্তু ওটা আর হয়নি। বিলাস যখন মারা গেল, ভজন তখন চৌত্রিশ। বিলাসের লিভারে সিরোসিস হয়েছিল। পেটটা যখন ফুলে গেল, সবাই

ভেবেছিল চর্বি হয়েছে। বিলাস ঠিকই বুঝেছিল ওটা জল। কালোমেঘ-এর বড়িতে কমবার নয়। ল্যাসিক্স বড়িতে এ জল যাবে না। বারাসতে গিয়ে ডাক্তার দেখালেন, কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই দেহাবসান হল। বাবার চেয়ারে বসল ভজন। বাবার শিক্ষা ছাড়া ও আরও কিছু মেডিকেল বইপত্র কিনল কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে। যেমন ডা. মদন রানা বিরচিত সচিত্র অ্যালোপ্যাথি শিক্ষা, সহজ ধাত্রীবিদ্যা, আবুল হাসনতের যৌন বিজ্ঞান ইত্যাদি। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভরা দুজন-একজন করে আসতে শুরু করেছিল আগেই। ওরা যেসব কাগজপত্র দেয় তা পড়ে মানে বুঝত পারত না বিলাস, ভজনও পারে না। একটা ডায়েরি আছে, ওখানে বাংলায় লিখে রাখে আলমিনডাজোল—কৃমির ওষুধ। ১০ এমজি ওয়ান ডোজ। হাঁটুর ক্ষয় হলে—কার্টিলেজ বানায় অট্রিভিট। ফ্যাম একটি নতুন অম্বলের ওষুধ। খালি পেটে খাইলে উত্তম। বেশি খাইলে মাথা ঘুরিবে। অ্যাম্পিসিলিনে অনেকের পেট খারাপ হয়। অ্যাম্পিজোলের মধ্যে কিছুটা মেটরোনিয়াডাজোল মিশ্রিত থাকে বলিয়া পেট খারাপ চেক হয়। এই নোটবুক ভরা আছে এরকম সব কিলবিল লেখাতে। ভালো কথা শুনলেই চট করে লিখে ফেলে। এই বইটাই মৃধা পরিবারের মেটিরিয়া মেডিকা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পিতার নোটবুকটি পূর্ণ করেছিল পুত্র।

এইভাবেই ডাক্তারি চলছিল। এমডি পড়ার সুযোগ হয়েছিল ধন্বন্তরি মেডিকেল কলেজে। ধন্বন্তরি শব্দটা ভজনের জীবনের সঙ্গে বেশ জড়িয়ে গেছে বলা যায়।

ধন্বন্তরি মেডিকেল কলেজের সূচনা হয় বারাসত রেল স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে, ১৯৯০ নাগাদ ওইখানে একটা লোক ট্যাংকি-সাফ পাউডার বিক্রি করে। এখানে ট্যাংকি মানে পেট। হরিতকি, বেলশুঁঠ ইত্যাদি পাউডার মিশিয়ে তৈরি হয় ওই পাউডার। লোকটা খুব ভালো বক্তৃতা করে। বলে সকালের কোষ্ঠ সাফ মানে হল ভৈরবী রাগিণী, মানে সকালবেলার ফুল ফোটা...অনেকের মুখে থাকে পিছনদ্বারের গন্ধ। কারণ হল পেট সাফ না-হওয়া। মেজাজ গরম, খিটখিটে ভাব—যদি না হয় পেট

সাফ। পেট ক্লিয়ার মানে লাইফ ক্লিয়ার। আপনি খুশমেজাজে কাজে যান দাদারা...এরকম কত কথাই বলে। ওই পাউডার কিনে নিয়ে যায় ভজন। ওই পাউডারের সঙ্গে এনট্রোকুইনলের গুঁড়ো মিশিয়ে পুরিয়া বানায় ভজন। ওই ট্যাংকি-সাফ কিনতে গিয়েই দেখল প্ল্যাটফর্মে ডালপুরির দোকানের পাশে লেখা, 'ডাক্তার হইবার সুবর্ণ সুযোগ। অলটারনেটিভ মেডিসিনে এমবিবিএস ডাক্তার হউন'। ওখানে ওভারব্রিজের তলায় ছোট একটা টেবিল-চেয়ার নিয়ে একটা লোক বসে আছে। একটা খাতা রয়েছে সামনে। লোকটার চোখে লাল, আর ঠোঁটের কোনায় ঘা। ওকে জিজ্ঞাসা করল ভর্তির পদ্ধতি। লোকটা বলল, ভরতির পদ্ধতি খুব সরল। টাকা দিলেই ভর্তি।

—আর এমবিবিএস ডিগ্রিটা?

—ওটা পেয়ে যাবেন।

—কারা দেবেন?

—বোর্ড অফ...ইয়ে।

—ইয়ে মানে?

—ওই, অলটারনেটিভ মেডিসিন।

লোকটা জিজ্ঞাসা করে,—আপনি কী করেন?

ভজন বলে, ডাক্তারি। আমি একজন কোয়াক ডাক্তার।

—ডাক্তার? তবে এমবিবিএস পড়তে যাবেন কেন? এক্কেবারে এমডি করে নিন।

—ক'দিনের কোর্স?

—দেড় বছরের। একটা হ্যান্ডবিল ধরিয়ে দিল লোকটা।

'সারা বিশ্বে এখন অলটারনেটিভ মেডিসিনের রমরমা। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ক্রমশ ব্যাকডেটেড হইয়া যাইতেছে। নেচারোপ্যাথি, ম্যাগনেটো থেরাপি,

আকুপাংচার, ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি ক্রমশ জনপ্রিয় হইতেছে। আমেরিকান কাউন্সিল অফ অলটারনেটিভের সহযোগিতায় আমরা সিলেবাস প্রস্তুত করেছি। কোর্স কমপ্লিট করিয়া একজন আধুনিক মেডিকেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করিতে পারিবেন ও দেশের ও দশের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

কোর্স :

১) এমবিবিএস—৩ বৎসর। শনিবার ও রবিবার। যোগ্যতা—স্কুল ফাইনাল/ হায়ার সেকেন্ডারি।

২) এমডি—দেড় বছর। কেবলমাত্র রবিবার। যোগ্যতা এমবিবিএস বা ৩ বৎসর ডাক্তারির অভিজ্ঞতা।

৩) ডিপ্লোমা ইন নেচারোপ্যাথি—১ বৎসর। শনিবার ও রবিবার।

৪) ডিপ্লোমা ইন ম্যাগনেটোথেরাপি—১ বৎসর। শনিবার ও রবিবার।

৫) ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইন ইলেকট্রো-হোমিও—২ বৎসর। শনিবার ও রবিবার।

অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত কোয়ালিফাইড শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান। ক্যামপাস :—বহিরগাছি বগলাচরণ বিদ্যালয়। বারাসত স্টেশন হইতে দুই কিলোমিটার, টাকি রোডের উপর। ক্লাস বিকেল পাঁচটার পর।

৪

স্থান—বগলাচরণ বিদ্যালয়

কাল—১৯৯১

সময়—সন্ধ্যা।

এমডি-র প্রথম ক্লাস। ক্লাস শুরুর আগে প্রিন্সিপাল অরূপ সাহা বক্তৃতা দিচ্ছেন—আপনারা হলেন ঐতিহাসিক এমডি কোর্সের ঐতিহাসিক ফার্স্ট ব্যাচ। যারা সরকারি মেডিকেল কলেজে এমডি পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের আমরা সুযোগ করে দিয়েছি। আপনারা এখান থেকেই হায়ার

স্টাডি করবেন। আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থা মূলত আপনাদের উপরই নির্ভরশীল। আমাদের এই গ্রাম বাংলায় সরকারি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তারদের তুলনায় আপনাদের মতো ডাক্তারই বেশি। আপনারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা। রাতবিরেতে আপনারাই পরিষেবা দিয়ে থাকেন। আপনারাই সুদূর গ্রামের মানুষদের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ করে দেন। আপনারা না হলে এখনও গাঁয়ের মানুষ তাবিজ-মাদুলি-ঝাড়ফুঁক-জলপড়ার উপরই নির্ভরশীল থাকত। প্রাইমারি হেলথ ক্লিনিকের কথা তো সবাই জানি। ডাক্তার থাকে না। যদিও কোথাও কোথাও সপ্তাহে এক-আধদিন ডাক্তার যায়, ওষুধ থাকে না। আন্ত্রিকের রুগি গেলে শুধু এক খাবলা নিরোধ দিয়ে দেওয়া হয়। (হাসি)

সরকারি ডাক্তাররা খুব অহংকারী। রুগির সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। সরকারের কাছ থেকে গাদা গাদা মাইনে নেন। সরকার কাদের টাকায় চলে? আমাদের টাকায়। আমরাই সরকারি ডাক্তারদের গাদা গাদা টাকা দিয়ে থাকি, বিনিময়ে পাই অবজ্ঞা আর অবহেলা। এই কোর্স আমাদের প্রতিবাদ। আপনারা মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন, মাটির কাছাকাছি থাকবেন...।

দশজন এমডি-র ছাত্র ছিল ফার্স্ট ব্যাচে। এরমধ্যে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করছিল ছ-জন, তিনজন অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস করছিল, আর একজন ছিল বায়োসায়েন্সে বিএসসি পাশ।

অধ্যাপক যারা ছিল—তাদের অধিকাংশ ছিল একটু অভিজ্ঞ কোয়াক ডাক্তার। কয়েকজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও ক্লাস নিত। ফিজিওলজির ক্লাস নিত বগলাচরণ বিদ্যালয়ের ডে বিভাগের বায়োসায়েন্স টিচার।

স্পেশালাইজেন ছিল মদ খাওয়া ছাড়ানোর উপায়। গ্রামঘরে এই সাবজেক্ট-এর খুব ডিমান্ড। ডাক্তার পোড়েল একজন নামকরা কোয়াক ডাক্তার। গলায় তুলসী মালার কণ্ঠি। উনি পড়াতেন কম্বাইন

থেরাপি। অ্যালোপ্যাথি, ইউনানি, হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজি ওষুধের মিশ্র ব্যবহার শেখাতেন। বেশ কিছু টোটকাও দিতেন।

ভজন মৃধার এমডি-র খাতায় আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে এইসব কাটিং তিলা-সুলতানি : পুং ইন্দ্রিয়ে মালিশ করার তেলগুলির মধ্যে ইহা বেস্ট। কেঁচো, বীর বহুটি (বর্ষার প্রারম্ভে দেখা যায় গাঢ় লাল রং-এর এক জাতীয় পোকা, বুকে ভর দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়) এবং এর সঙ্গে বন্য গিরগিটি বা সান্ডার তেল নিংড়ে লবঙ্গর তেল, কস্তুরী মিশিয়ে যে তেল তৈরি হবে, তা শিথিল ইন্দ্রিয়ে মালিশ করলে ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা আসে।

কামচন্দ্রোদয় মাজন : মনাক্কা, জটামাংসির সঙ্গে সামান্য খৈনি, এলাচ গুঁড়া এবং পালসেটিলা-৩০ দুই ফোঁটা মিশ্রিত করে একটি মাজন প্রস্তুত করো। রাত্রে শয়নের পূর্বে ওই মাজন দ্বারা দাঁত মাজলে সংগমেচ্ছা জাগবে।

পাঁঠার অণ্ডকোষ ছাগলের দুধে সেদ্ধ করে তার মধ্যে সামান্য মধু মিশ্রিত করে খেলে বীর্য ঘন হবে।

এইসব শিক্ষা ভজনের কাজে লেগেছে বই-কি। ভজন শিমুল মূলের গুঁড়োর সঙ্গে ইস্টনস সিরাপ মিশিয়ে যৌনতাবর্ধক ওষুধ দেয়। সকালে চিলিডিয়াম মাদার টিংচার, তারপর দুপুরে হিঞ্চেপাতার রস দিয়ে মেট্রোজিল, সন্ধ্যাবেলা লিভোজেন সিরাপ—এই ধরনের প্রেসক্রিপশন করে। কালো জামের বিচির গুঁড়ো, নাক্সভমিকা আর জিনট্যাক একই প্রেসক্রিপশনে লেখা হয়।

বাংলার মানুষ এইসব টোটকা খেতে পছন্দ করে। যখন বলা হয় কাঁচা হলুদের রস খাবেন রোজ সকালে, দু-একটা থানকুনি পাতা ভালো করে ধুয়ে চিবিয়ে খাবেন, মানুষের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানুষের মনে হয়, এই ডাক্তার যেন নিজেদের লোক, যেন আপনজন। চিন এবং জাপানে নাকি ওদের দেশীয় ওষুধের সঙ্গে পাশ্চাত্য ওষুধের মিলিত চিকিৎসা পদ্ধতি আছে। চিন ওদের আকুপাংচার নানা রোগের চিকিৎসার কাজে লাগিয়েছে। আমাদের দেশের মেডিকেল শিক্ষা ব্রিটিশরা যেমন চেয়েছিল

তেমনই আছে। বরং দেশীয় চিকিৎসা উপেক্ষিত হয়েছে। বিশেষত পশ্চিমবাংলা, কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, রাজস্থান—এরকম আরও রাজ্যে আয়ুর্বেদ বেশ উন্নত। গবেষণা হয়েছে। পশ্চিমবাংলাতেই উপেক্ষার চোখে দেখা হয়েছে আয়ুর্বেদকে। পশ্চিমবাংলার গ্রামেগঞ্জে আয়ুর্বেদকে অ্যালোপ্যাথির সঙ্গে সমন্বিত করার ভার নিতে হয়েছে ধন্বন্তরি মেডিকেল কলেজদের, ভজন মৃধাদের।

৫

ভজন মৃধা এখন তারাপীঠে। একটা দিন চেম্বার কামাই মানে গ্রেট লস। কিন্তু করার কী আছে। মায়ের কাছে এলে এত চিন্তা করলে চলে না। গতকাল রাত্রে একটা শুটিং দেখেছিল ভজনরা। এক বাবা যজ্ঞ করছিল, সেই যজ্ঞের ভিডিয়ো তোলা হচ্ছিল। কোন এক কেবল চ্যানেলে দেখানো হবে। শ্মশানে একটা ছোট ফোল্ডিং টেবিলে মেক-আপ ম্যান বসে আছে। টেবিলের উপরে পাউডার, লিপস্টিক, ভ্রূ রং করার পেনসিল এইসব। যজ্ঞে বসার আগে বাবার চুলে কিছুটা পরচুলা মিশিয়ে দেওয়া হল। চুল ঝাঁকড়া করা হল। বাবার নাম দুর্বাসা মুনি (আসল)। কয়েকটা চ্যানেলে নিয়মিত বসেন। এক সুন্দরী উপস্থাপিকা মেক-আপ করে নিল। বলল—মহা তান্ত্রিক দুর্বাসা মুনি মানুষের কল্যাণের জন্য যজ্ঞ করছেন। পৃথিবীর শান্তির জন্য, রোগব্যাধি বিনাশের জন্য যজ্ঞ করছেন। এই যে আমাদের আকাশের ওজোনস্তর ফুটো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, ঢুকে যাচ্ছে আলট্রা ভায়োলেট রে, এই মন্ত্রপূত যজ্ঞের ধোঁয়া আকাশে উঠে ওজোন স্তরের ফুটো মেরামত করে দেবে...।

বেশ। বেশ। একটা মানসিক শান্তি পায় ভজন ডাক্তার। বেলশুঁঠে এনট্রোকুইনাল কিংবা সুগার অফ মিল্ক-এ একটু স্টেরয়েড মিশিয়ে এমন কী অন্যায় করেছেন?

যজ্ঞ ঘিরে তীর্থযাত্রীরা। স্থানীয় মানুষও আছে। যজ্ঞ হচ্ছে, ঘি পড়ছে, ধোঁয়া উঠছে। ভজন ডাক্তারের স্ত্রী রেবতী হাতজোড় করল। তাই দেখে ছেলে সুবোধও। সুবোধ বোধহয় এখানেও ওর মনস্কামনা

জানাচ্ছে। ভজন হাতজোড় করেনি। হয়তো জানে এটা যজ্ঞ নয়, যজ্ঞের অভিনয়। সুবোধ সব জায়গায় ওর মনস্কামনা জানাচ্ছে। তারামায়ের কাছে তো বটেই, শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গের কাছে বসে হাতজোড় করে বিড়বিড় করেছে, এমনকী মন্দিরের বাইরে স্থাপিত শিবের ষাঁড়টির কাছেও।

সুবোধ সত্যি বড় সুবোধ বালক। মা-বাবার বড় ভক্ত। সুবোধের বাপ-মায়ের ইচ্ছে ও যেন ডাক্তার হয়। বাপ-দাদুর মতো ডাক্তার নয়, পাশ করা ডাক্তার। বাপ-মায়ের এত ইচ্ছে বলে সুবোধেরও তাই ইচ্ছে হয়েছে। জয়েন্ট দিয়েছে। পরীক্ষা খুব খারাপ হয়েছে। খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

ছেলেকে ডাক্তার করানোর ইচ্ছে বহুদিনের। ছেলের বয়স যখন পাঁচ, তখনই বারাসতে একটা বাড়ি কিনে নিয়েছিল ভজন ডাক্তার। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্যই মূলত। ভদ্রলোক হওয়ার দুটো পথ। ক্রমশ ব্রাহ্মণত্বের দিকে যাত্রা এবং ক্রমশ শহরের দিকে যাত্রা। বাড়িতে ঠাকুর রেখেছে ভজন, উঠোনে তুলসী গাছ। এসব ভজনের বাবার আমলে ছিল না। ভজনের বাবার শ্রাদ্ধে বামুন ভোজন করিয়েছিল। বাবার শ্রাদ্ধ করেছিল উনিশ দিনে। বামুনরা এগারো দিনে করে। ভজন লিখে যাবে ওর মৃত্যুর পর যেন তেরো দিনে শ্রাদ্ধ করা হয়। যা হওয়ার হবে। ওর ছেলে সুবোধের সময় ওটা এগারো দিনে হয়ে যাবে। বামুনদের এগারো দিনে শ্রাদ্ধ হয়। বাড়ির সামনের দরজার এক দিকে ওঁ অন্য দিকে রেডক্রশ। শহরের দিকে যাত্রাটাও তো চলছে। আর বারাসতে বাড়ি কিনেছিল বেশ কয়েক বছর আগেই। শুঁটিয়া ছেড়ে বারাসতে বসবাস করছে দশ বছর হয়ে গেল। ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো হয়নি ঠিকই, তবে ছোট মেয়ে অপর্ণাকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো হচ্ছে। রাস্তায় কারোর সঙ্গে ঝগড়া হলে ফটাফট ইংলিশ বলে দেয়। রাজস্থান বেড়াতে যাওয়ার সময় ট্রেনে চেকারকে ইংলিশ বলে কাবু করে দিয়েছিল। এখন জলখাবারে ব্রেড-বাটার, এগ পোচ, জ্যাম এইসব খাওয়া হয়। অপর্ণাকে টিফিনে স্যান্ডুইচ করে দেওয়া হয়। অপর্ণার ক্লাস নাইন। জিনস পরে। বারাসতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে না ভজন। বারাসতে কারুর সঙ্গে খুব একট মেশামিশিও করে না। সময়ই বা কোথায়!

সকালবেলায় জলখাবার, স্যরি, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে যেতে হয় শুঁটিয়া। বেলা দুটোয় ঘরে ফেরা, স্নান খাওয়াদাওয়া, সামান্য দিবানিদ্রা। আবার সন্ধের সময় চেম্বার। শুঁটিয়া থেকে আরও চার কিলোমিটার দূরে নতুন ঘোলা গ্রামে একটা চেম্বার হয়েছে কয়েক বছর হল। বিকেলে ওখানে এক-দেড় ঘণ্টা বসছে, তারপর আবার শুঁটিয়া। একটা গাড়ি কিনেছে। ডিজেল অ্যাম্বাসাডর। মেয়ে বলে অ্যাম্বি। গাড়ির সামনে-পিছনে লাল ক্রস-এর স্টিকার মারা। বারাসাত শহরের ওপর দিয়ে যখন গাড়িটা যায় তখন রেড ক্রসটার দিকে তাকালে মনের ভিতরে একটু পোড়ে। ও জানে এই শহরে ও ডাক্তার নয়। এই শহরে অনেক ডাক্তার আছে। এই বারাসত শহর ওকে সত্যিকারের ডাক্তার মনে করে না। মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে গেলেই গাড়ির কাচে গাছের ছায়ায় মেশানো রেড ক্রসটার দিকে লুঙিপরা মানুষেরা, ড্রপ আউট ছেলেমেয়েদের বাপ-মায়েরা, উকুন বাছতে থাকা, ছাগল খুঁজতে থাকা, কাপড় শুকোতে দেওয়া মানুষরা সম্ভ্রমে তাকায়। যতই বারাসতে থাকুক, বারাসতকে ভালো লাগে না ভজনের। তবু এখানেই থাকতে হচ্ছে। কলকাতা তো আরও খারাপ। তবু ওখানে যেতে হবে। একটা ফ্ল্যাট বুক করেছে দমদম নাগের বাজারের কাছে। কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট না থাকলে প্রেস্টিজ থাকে না। ছেলেমেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ এলে বলা যাবে কলকাতায় ফ্ল্যাট আছে। ক্রমশ কলকাতার কাছাকাছি যাওয়া মানে ক্রমশ কুলীন হয়ে ওঠা।

ছেলে যদি ডাক্তার হয়ে যায় তখন কলকাতার ফ্ল্যাটেই থাকবে ও। পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে লিখবে—পাত্র ডাক্তার, নিজস্ব ফ্ল্যাট। লিখবে উচ্চ অসবর্ণে আপত্তি নাই। বামুন, কায়েতের ঘর থেকে সম্বন্ধ আসবে।

খাওয়াদাওয়ার পর এখন ব্যাগট্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ভজন ডাক্তার। নিজেদের গাড়ি করেই এসেছে ওরা। এখন যাচ্ছে বামাখ্যাপার ভিটে দেখতে। যেতে যেতে দেখল রাস্তার ধারে একটা খড়ের চালের বাড়ির মাটির দেয়ালে আলকাতরায় লেখা—ডা. মদনমোহন হাটি। প্রাইভেট প্যাকটিশনার। হ্যাঁ,

ঠিক এই বানান। ভজন এর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করল না। নিজেকে মনে হল এর থেকে আলাদা। অনেক এগিয়ে থাকা। ওর গাড়ি আছে। মদন হাটির গাড়ি নেই। হয়তো সাইকেল চেপেই রুগি দেখতে যায়। হয়তো সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে বা রডে বেঁধে নিয়ে আসে লাউ, কুমড়ো, কুঁচো মাছ...। রুগি দেখার ফি। ও প্র্যাক্টিস নয়, প্যাকটিস করে।

আজকের খবর কাগজটা খুলল গাড়িতে। একটা নিবন্ধের মতো দেখল—

পশ্চিমবঙ্গের ৭৮ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতায় ভোগে।

প্রসূতিদের মধ্যে মাত্র ৩৮ শতাংশ প্রসবের সময় ডাক্তার, নার্স বা অন্য কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পেয়ে থাকে।

৪০ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম।

৪২ শতাংশ শিশুর পেটে কৃমি আছে।

৬০ শতাংশ মানুষ জীবাণুবর্জিত পরিশুদ্ধ জল পান করতে পারে না।

অর্ধেকেরও বেশি কৃষিজীবী নিরক্ষর। কৃষি পরিবারগুলির ৭০ শতাংশ মহিলা অক্ষরজ্ঞানহীন।

বামাখ্যাপার ভিটেতে পৌঁছোল ওরা। বামাখ্যাপার বংশধরদের এখন অনেক শরিক। সবাই একটা করে মন্দির করে রেখেছে। প্রত্যেকেই উঠোনে একটা করে মাটির ঘর দেখিয়ে বলছে এখানেই বামাখ্যাপা জন্মেছিলেন। সব ঘরের ভিটে থেকেই এক চিমটি করে মাটি উঠিয়ে নিল রেবতী। এইসব পুণ্য মাটি যত্ন করে কাগজে মুড়িয়ে রাখল। বারাসতের বাড়িতে উঠোন নেই, ঠাকুরঘর আছে। ঠাকুরঘরে রেখে দেবে। রেবতী ছেলেকে বলেছিল—পাখনাটা ঠিকমতো জানাস। সুবোধ চারটি ভিটেতেই মাথা ঠেকিয়ে বামাখ্যাপাকে বলেছিল—জয়েন্টে যেন মেডিকেলে চান্স পাই।

৬

কেউ কথা শোনেনি। শিব, ষাঁড়, তারা মা, বামাখ্যাপা, কেউ না। জয়েন্টের লিস্টে নাম নেই। থাকার কথাও নয়। তবু দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছে, যদি কিছু অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যায়। যদি ভুল করে ৩৮-এর পরিবর্তে ৮৩ ছাপা হয়ে যায়। যদি তন্ত্রবল কম্পিউটারকে ভুল করিয়ে দেন। এরকম কতভাবেই তো কত কী হতে পারে, পৃথিবীতে কত কী হয়, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

কিন্তু ওরকম কিছু হল না। জয়েন্টে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং কিছুতেই নাম নেই। এ নিয়ে বাড়িতে শোক-টোক কিছু হয়নি। কিছুদিন পর হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বের হল। সেকেন্ড ডিভিশন নম্বর ছিল। কোনওরকমে পাসকোর্সে বিএসসি-তে ভর্তি হল। সময়টা ২০০১।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল ভজনের—এমবিবিএস হন ম্যানেজমেন্ট কোটা। ঠিকানা, ফোন নম্বর সব রয়েছে।

একদিন দুপুরে খোঁজ করতে গেল ভজন। মহাত্মা গান্ধি রোড-এ লোহার ট্যাংকের দোকানের পাশে একটা ঘর। ঘরটা দু-ভাগ করা। ডানদিকে মুখরুচি ক্যাটারার, বাঁ-দিকে ক্যারিয়ার পয়েন্ট। একটা লোক বসে আছে, চোখের তলায় ফোলা, একটা সাদা দাগ। ভজন মাল খাওয়া মুখ চিনতে পারে। এটা ওর ক্লিনিকাল অবজারভেশন। এমনকী বিলিতি খাওয়া মুখ, না দিশি খাওয়া মুখ বুঝতে পারে। বিলিতির মধ্যেও স্কচ খাওয়া মুখও আলাদা করতে পারে। গাঁজা খাওয়া মুখও চিনতে পারে। এটাই অভিজ্ঞতা। বিলেত থেকে পাশ করা ডাক্তারদের এই অভিজ্ঞতা নেই। লোকটা বিলিতি খায়। বাঁ-হাতে একটা লাল সুতো বাঁধা। দু-হাতে গোটা সাতেক আংটি। লোকটা ঝিমোচ্ছিল। ভজনকে দেখে চাঙ্গা হল। ভজন ওর আসার কারণ জানাল। লোকটা ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বার করল।

জিজ্ঞাসা করল,—কোন ডিভিশন?

—সেকেন্ড।

তবে মণিপালে হবে না। ভেলোরে হবে না। পুনের সাভারকার মেডিকেল কলেজে সিট আছে। তেইশ লাখ।

—তে-ই-শ লাখ?

—ভালো কলেজ। রেপুটেড কলেজ। আপনি এক কাজ করতে পারেন, ইন্দোর ঝাঁসিরানি মেডিকেলে করে দিচ্ছি। কমেই হবে। আঠারো।

—এত?

ইনস্টলমেন্টে দেবেন। ব্যাংক লোন পাবেন। আঠারো লাখ উঠিয়ে নিতে ক-দিন লাগে?

এত টাকা খরচ করার সাহস নেই ভজনের। ভজন চুপ করে থাকে।

—নেপালে পড়তে পারেন। নেপালে কিন্তু কম হয়।

—কম মানে—

—পনেরোয় করে দেব। এটাই লোয়েস্ট।

—একটু ভাবি।

আর এক জায়গায় গেল ভজন। সেটা বেশ সাজানো-গোছানো, এসি বসানো ঘর। ঝকঝকে টেবিলে একজন মহিলা। পুরু ঠোঁটে কালচে-খয়েরি লিপস্টিক। বলল,—চায়নায় পাঠিয়ে দিন। ইন্ডিয়ান কারেনসিতে মাত্র সাত লাখ টাকা টিউশন ফি। হোস্টেল চার্জ তিন লাখ মতো, আর যাতায়াত ভাড়া। ইন্ডিয়ার চাইতে চিপ। এমনকী নেপালের তুলনাতেও সস্তা। আমরা গত বছর একশোজনকে চিনে পাঠিয়েছি।

—চিনারা কি আরশোলা খায়? মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভজন জিজ্ঞাসা করে। লিপস্টিক-ঠোঁট হেসে ওঠে। বলে,—চিনারা খায় খাক, তাতে আমার-আপনার কী? ফরেন স্টুডেন্টদের কনটিনেন্টাল ডিশ দেয়। এখন এত বেশি ইন্ডিয়ান ছাত্র যাচ্ছে, লুচি-পুরি-দোসা—এসব মেনুর মধ্যে ঢুকে যাবে।

চিনে খরচ কিছুটা কম সত্যি কথাই। কিন্তু গিন্নি চিনে পাঠাতে রাজি হল না। আরশোলা-টিকটিকি-গিরগিটি—এসব ভয় তো ছিলই, তাছাড়া পাঁচ বছর ছেলেকে দেখতে না পাওয়ার আশঙ্কা। ভারতের যে-কোনও জায়গায় পড়লে ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব, কিন্তু চিন মানে তো সেই অচিনপুর।

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল ভজন। ছেলে তো সত্যিই সুবোধ। বলল,—তোমরা যেখানে পাঠাবে সেখানেই যাব।

—মাকে ছেড়ে চার বছর থাকতে পারবি? সুবোধ বুঝতে পারে না 'হ্যাঁ' বলা উচিত নাকি 'না' বলা উচিত, ও হাঁ করে থাকে।

অপর্ণা বলে, চিন মানে তো ফরেন, তাই তো? দাদাকে চিনেই পাঠাও। বেশ ফরেন ডিগ্রি হবে...।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল আবার চিনের এমবিবিএস মানে না। ভারতবর্ষে প্র্যাকটিস করতে হলে আবার পরীক্ষা দিতে হয়। ঝামেলা আছে। তার চেয়ে ইন্ডিয়ান ডিগ্রিই ভালো। যদি লাখ দশেক টাকা লোন নেওয়া যায়, তবে মাসে দশ হাজার করে শোধ করতে হবে বছর বিশ। ছেলের নামে এডুকেশন লোন হতে পারে। কিন্তু পাশ করেই মাসে দশ হাজার টাকা করে লোন শোধ করা কি ওর দ্বারা সম্ভব হবে? ছেলে খুব একটা খেলুড়ে নয়। রুগি খেলাতে পারবে? টাকা তুলবার কায়দা আছে।

নিজের কাছে এখন খুব বেশি টাকা নেই। গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, কলকাতায় ফ্ল্যাট বুক করা হয়েছে, মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। এত আমদানি নেই। অন্য ডাক্তাররা যেমন নানারকমের রোজগার করে, ভজনের তত নেই। ভজন মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে পারে না। ওর মেডিকেল সার্টিফিকেটে এখন প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টারও আপত্তি করছে। বড় প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি থেকে কমিশন পাঠায় না। ছোটগুলো পাঠায়। ভজন ছোট ছোট ল্যাবেই স্যাম্পল পাঠায়। কোনও কোনও পেশেন্ট পার্টি বড় ল্যাব থেকে করিয়ে আনে, ভজন কিছু বলতে পারে না। কিছু মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ

আসে, কিন্তু বড় কোম্পানি আসে না। কোনও বাঁধা মাইনের চাকরি নেই, পেশেন্ট যা দেয়। পেট খসানোও কমে গেছে। এখন যেখানে অবৈধ সম্পর্ক আছে, সেটা কনডোমের মাধ্যমেই হচ্ছে। কনডোম কিনতে এখন আর লোকের লজ্জা নেই। মুদি দোকানেও কনডোম বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া মেয়েরা আজকাল মালা-ডি খেয়ে নিচ্ছে। আর আলট্রাসোনোগ্রাফি করে যারা পেটের বাচ্চা ছেলে না মেয়ে জেনে নিয়ে মেয়ে বাচ্চা খসিয়ে দিচ্ছে, ওদের অনেক টাকা। ওরা বড় নার্সিংহোমে-এ যায়। সব নিয়ে একটু ক্রাইসিসে আছে ভজন। এরকম অবস্থায় এতগুলো টাকা...।

রেবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে ভজন। রেবতী বলে,—সামনের বার যদি ভালো করে পড়াশোনা করে আর...কথা থামিয়ে দেয় ভজন।

—যতই পড়ুক হবে না। জামের বিচি থেকে কি আপেল গাছ হয়! আমি কী আমি জানি। তুমি কী তাও জানি। তোমার বাবা কী তাও জানি। জয়েন্ট দিয়ে পাওয়ার গপ্পো নেই।

অথচ মন মানে না। দাদু ডাক্তার, বাবা ডাক্তার, দুজনে কেউ আসলে ডাক্তার ছিল না। দুই পুরুষের প্রত্যাশার মেঘ তৃতীয় পুরুষে বৃষ্টি হয়ে নেমেছে।

বেচারা সুবোধ। ও কী করে? ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃষ্টিতে ভিজছে। ওর করবার কিছু নেই। পরের সপ্তাহে আবার নতুন বিজ্ঞাপন দেখে ভজন। লেখা হচ্ছে এমবিবিএস ইন ভেরি চিপ রেট। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট বুক। ফিউচার বিল্ডার্স।

এটা মৌলালির কাছে। একটা ঘর পার্টিশন করা। ভিতরে চেম্বার, বাইরে ভিজিটার্স। ডাক্তারদের যেমন থাকে। বাইরে একটা লোক বসে আছে। ও একটা খাতায় ভিজিটারদের নাম-ঠিকানা, কীসে ভর্তি করাতে চায় টুকে নিচ্ছে। খাতায় একটা ঘর আছে। ওখানে মান্থলি ইনকাম লিখতে হয়। ভজন ভাবতে লাগল কত লেখা উচিত। বেশি লিখলে ওরা পেয়ে বসবে। ও একটু কম করেই লিখল। ভিতরে যেতে বলল। ভজন ভিতরে গেল। একটা কমবয়সি ছেলে বসে আছে। ঘরে খুব সুন্দর একটা ক্যালেন্ডার।

তাজমহলের একটা ভারী সুন্দর ছবি। ঘরের ভিতরে সুগন্ধ। ছেলেটার বেশ সুন্দর চেহারা। ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল,—ডাক্তারি?

—হ্যাঁ।

—আপনি কী করেন?

—আমি ডাক্তার। কোয়াক ডাক্তার, কোয়াক।

—কর্ণাটকে পাঠাবেন?

—কীরকম খরচা?

—সাতাশ লাখ।

—তবে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন চিপ রেট।

—বিডিএস পড়ান, কম হয়ে যাবে।

—বিডিএস? ডেন্টাল সার্জন? কত পড়বে?

—উনিশ।

—এ আর কম হল কী।

—তাহলে বিএএমএস পড়ান, আয়ুর্বেদ।

—কবিরাজি? না-মানে...

—আয়ুর্বেদ বিএএমএস ডাক্তাররা সারা ভারতে এমবিবিএস ডাক্তাদের অ্যাট পার জানেন?

—না, মানে পশ্চিমবঙ্গে তো...

—পশ্চিমবঙ্গেও চাকরি হয়। হেলথ সার্ভিসে নেয়।

—ওটা কত পড়বে?

—দশ লাখ।

—এত পারব না।

—তা হলে হোমিওপ্যাথি পড়িয়ে নিন। হোমিওপ্যাথিতেও জয়েন্ট এনট্রান্স দিয়ে ঢুকতে হয়। বিএইচএমএস ডিগ্রি দেয়। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে পারে, ডেথ সার্টিফিকেটও দিতে পারে।

—ওটা কত?

—ওটা সাত লাখ।

খুব মোক্ষম জায়গায় ব্যথাটা লাখল ভজন মৃধার। ভজন সার্টিফিকেট দিতে পারে না। সার্টিফিকেট দেওয়ার শখ বহুদিনের। কীভাবে সার্টিফিকেট দিতে হয় তার বয়ান ওর মুখস্থ।

ভজন চুপ করে বসে থাকে। একবার ভাবে হোমিওপ্যাথিটা পড়িয়ে নেবে কিনা। ভজনের নিজের হোমিওপ্যাথির ডিগ্রি নেই। ও যখন অলটারনেটিভ মেডিসিন পড়েছিল, তখন একজন হোমিওপ্যাথির কয়েকটা ক্লাস নিয়েছিল। ভজন এখনও আর্নিকা, নাক্সভোমিকা, ব্রাইওনিয়া, রাসটক্স, বেলেডোনা এইসব ব্যবহার করে। সেই টিচার আবার ছড়ায় পড়াতেন। কয়েকটা ছড়া আজও ভোলেনি। হুট করে মনে পড়ে গেল ভজনের।

ছোট ছোট কৃমি যদি থাকে মলদ্বারে,

টিউক্রিয়াম ত্রিশ শক্তি দিয়ো বারে বারে।

শিশুদের শয্যামূত্র, দাঁত কড়মড় করে—

সিনা ২০০ সপ্তাহে এক কৃমি-দোষ সারে।

সেন্টোনাইন এক গ্রেন দুইবার করিয়া,

খাইলে কৃমির বংশ যাবে বাহিরিয়া—

এটা কৃমির ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল।

পৃষ্ঠাটা টেবিলের কাচের তলায় রেখেছিল বহুদিন।

হোমিও পাশ করলে সুবোধকে চেম্বারে রেখে কিছুটা অ্যালোপ্যাথি নিজে শিখিয়ে দিতে পারবে...। মিক্সড নয়। মিক্সড করে পাতি কোয়াকগুলো। পিওর হোমিওপ্যাথিই ভালো। তো হোমিওপ্যাথিই যদি পড়ানো হবে তো সাত লাখ টাকা দিয়ে কেন? সামনের বছর জয়েন্ট দেওয়া যাবে। হোমিওপ্যাথি পড়াতে পঞ্চাশ হাজার টাকাও লাগবে না।

—কী স্যার, এতক্ষণ চুপ করে আছেন যে...। লোকটা বলে।

—ভাবছি।

—কী ভাবছেন? ভাবনার কোনও শেষ নেই।

—না, ভাবছি হোমিওপ্যাথিই যদি পড়াব, সামনের বার হোমিওর জয়েন্টে বসিয়ে দেব। এত টাকা খরচা করতে যাব কেন? কষ্টের টাকা...।

—ইয়ার লস করাবেন কেন? এক বছর আগে থেকে যদি ডাক্তারিটা শুরু করে আপনার টাকা উশুল হয়ে যাবে।

তা বটে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে ভজন। তারপর বলে, নাঃ, সামনের বছর হোমিওপ্যাথিই পড়াব। কিন্তু আপনারা মিথ্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। লিখেছেন চিপ রেট-এ এমবিবিএস পড়াচ্ছেন। হোমিওপ্যাথি লেখেননি কিন্তু।

মিথ্যে বিজ্ঞাপন দিইনি। চিপ রেটেই হবে। আগে তিনদিন ধরে ভাবুন ছেলেকে কী পড়াবেন। তিনদিন পর ফোন করব। খাতায় ফোন নম্বর লেখা আছে তো?

বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে ভজন। গিন্নির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার কোনও মানে নেই। ও কোনও স্পষ্ট মতামত দেবে না। বিএসসি পাস কোর্সে পাশ করে কী চাকরি পাবে কে জানে? তার চেয়ে হোমিওপ্যাথি পড়াটা খারাপ না। তৈরি চেম্বার, তৈরি রুগি। বলছে বটে, দু-হাজার দশ সালে সকলের জন্য স্বাস্থ্য। ক্যাঁচকলা হবে। চুল্লু যতদিন আছে, লিভার আর গ্যাস্ট্রিকের অসুখ ততদিন

থাকবে। লিভারের রুগিদের চিকিৎসার করা সহজ, কারণ চিকিৎসা হয় না। কোনও কোনও জন্ডিস এমনিই সেরে যায়। না সারলে সোজা বলে দাও হাসপাতালে যাও। গ্যাস্ট্রিকের অনেক ওষুধ আছে, খাওয়ালে কিছুদিন ভালো থাকে, আবার হয়। চামড়ার রোগী প্রচুর। চাষিরা মাঠে নামে, জুতো-টুতো পরার অভ্যেস নেই। জল-হাজা লেগেই আছে। দাদও প্রচুর। চামড়ার রুগির সুবিধে হল, চামড়ার রুগি মরে না, আর সহজে সারে না। পেটের রোগও থাকে যাবে। হাত ধোয়ার অভ্যেস নেই। ইস্টিশন-বাজারে যেসব খাবার-দাবার বিক্রি হয়, তাতে মাছি-টাছি ভালোই পড়ে। পেটটাও ভালো করে ধোয়া হয় না। যে জলে ধোয়া হয়, তার চেয়ে না ধোয়াই ভালো। বলে না, জলই জীবন। এই জলই, মানে খারাপ জলই বাঁচিয়ে রেখেছে কোয়াক ডাক্তারদের। প্রতি পাঁচ জনের তিন জনের পেটের গন্ডগোল। পায়খানা মাঠে। কৃমির ডিম ছড়াচ্ছে জলে, শরীরেও। রুগির সাপ্লাই যদি থাকে, আর রুগি যদি গরিব হয়, হোমিওপ্যাথির মার নেই। আবার অনেক মুসলমান রুগি আছে যারা পুরিয়া নেয় না, লিকুইড চায়। শিশি মসজিদে নিয়ে শিশির দাবাইটাতে ইমাম সাহেবের ফুঁ মারিয়ে নেয়।

কিন্তু হোমিওপ্যাথিই যদি পড়বে তো বাইরে এত টাকা দিয়ে পড়তে যাবে কেন? কলকাতাতেই তো আছে। তাছাড়া একটা কথা আছে, যার নাই কোনও গতি সে পড়ে হোমিওপ্যাথি। তবে এক কাজ করলে হয়। কলকাতার ফ্ল্যাট এখন থাক। যে টাকা দিয়ে বুকিং করা হয়েছে সেটা ফেরত চেয়ে নিলে হয়। যা আছে সব জোগাড় করে নেপালে পাঠালে কেমন হয়?

এইসব চিন্তায় ঘুম হয় না ভজনের। ছেলের কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখছে। বউকে জিজ্ঞাসা করে ভজন—হ্যাঁ-গো, তোমার মোট ক-ভরি গয়না আছে বলবে? রেবতী বলল,—কেন, গয়নার খোঁজ নিচ্ছ কেন!

—না, জানতে চাই আমাদের কী আছে। ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে হবে না?

—তা বলে গয়নায় হাত দিতে হবে?

—ছেলের জন্য গয়নাগুলো ছাড়তে পারবে না!

—কত কষ্ট করে করেছি ওগুলো...। পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকা করে সরিয়ে-সরিয়ে গয়নাগুলো করিয়েছি।

—তোমার ছেলে কি তোমার গয়না নয়! বুঝবে কী করে। বিদ্যাসাগরের মায়ের কথা পড়েছিলাম ইস্কুলে, এখনও মনে আছে। বিদ্যাসাগর ওর মাকে গয়না গড়িয়ে দিতে চাইল, তখন বিদ্যাসাগরের মা বলল,—তুই তো আমার গয়না, আমার আর গয়নার দরকার নেইকো।

—সে আলাদা কথা। কিন্তু তোমার কী এমন দুরবস্থা হল যে সামান্য গয়নাগুলোও বেচতে হবে?

—ডাক্তারি পড়াতে কত খরচ লাগছে জানো? বারাসতের এই পুরো বাড়ি বেচে দিলেও হবে না।

রেবতী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তুমি যেরকম ডাক্তারি পড়েছ সেরকম পড়লে হয় না? তুমি তো খারাপ নেই। ছেলে বিএসসিটা পাশ দিক, তারপর এইটা পড়ুক। ডিগ্রিটাও লম্বা হবে। তুমি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ো'খনে। এতগুলো টাকা...। আমাদের যদি বড় অসুখ-বিসুখ করে তো কী হবে?

ভজন বলে—আর ওটা নেই। বামফ্রন্ট সরকার ওসব উঠিয়ে দিয়েছে। অলটারনেটিভ মেডিসিনের সব কোর্স উঠিয়ে দিয়েছে। চার বছর হয়ে গেল।

মোটামুটিভাবে একটা সিদ্ধান্তে আসে।—এ বছর নয়, আগামী বছর হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদে জয়েন্টে বসবে।

একটা ফোন এল।

ফিউচার বিল্ডার্স থেকে বলছি। তিন দিন পর ফোন করব বলেছিলাম। কিছু ভাবলেন? ভজন বলল,—ভেবেছি, সামনের বছর আবার জয়েন্টে বসাব।

—সামনের বছরও হবে না।

—কবিরাজি আর হোমিওপ্যাথির জয়েন্টে বসাব।

—ওখানেও হবে না।

—কেন?

—আপনার ছেলের মার্কশিট আমি দেখেছি। ওসব জয়েন্টেও টাফ কম্পিটিশন। একটা পাশ করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের এখন ফি কত জানেন? মিনিমাম ফর্টি রুপিস। আর আয়ুর্বেদ ডাক্তাররা কীসে টাকা কামাচ্ছেন জানেন তো, কিছু মনে করবেন না স্যার, পেনিস মোটা করার ঢপ দিয়ে। আজকাল পেনিস মোটা করার ক্রেজ হয়েছে। আবার এ-ও শুনছি, আজকাল সবাই নাকি কম বয়সে ধ্বজ হয়ে যাচ্ছে, আর সব কবিরাজের কাছে ছুটছে। কবিরাজদের এখন বাজার ভালো। কবিরাজি পড়াতেই পারেন। বিএএমএস। সে তো আগেই বলেছি। তবে লিখে নিন, জয়েন্টে হবে না। ম্যানেজেমেন্ট কোটা দরকার হবে। আপনি ম্যাক্সিমাম কত খরচ করতে পারবেন?

—সাত-আট লাখ।

—আরও কিছু উঠুন।

—পারব না স্যার।

স্যার বলে ফেলল ভজন। একটু আগে ওই ছেলেটাই স্যার বলেছিল ভজনকে। এখন ভজন স্যার বলে ফেলল।

—আসুন দু-একদিনের মধ্যে দেখি কী করতে পারি।

আবার গেল ভজন। কলকাতা যেতে ভালো লাগে না ভজনের। বিচ্ছিরি হট্টগোল, ধোঁয়া, বাস, মিনিবাস, অটোর চেঁচামেচি। রাস্তাও ভুল হয়ে যায়। কলকাতায় গাড়ি আনে না ভজন। অনেকটা তেল পোড়ে। ট্রেনে শিয়ালদহ নেমে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে কেমন বে-দিশা লাগে ভজনের। বারাসত-বামনগাছি-দত্তপুকুর কেন্দ্রিক জীবনটাতেই অভ্যস্ত ভজন। মাছওয়ালা খাতির করে,

রিকশাওয়ালারা ডাক্তারবাবু বলে জোড় হাত করে। যে মাছওয়ালার বউকে ভুল চিকিৎসায় মেরে ফেলেছিল ভজন, সেই মাছওয়ালাটিও পাতলা ডিমওয়ালা পদ্মার ইলিশ বেছে রাখে।

ফিউচার বিল্ডার্স-এ আবার গেল ভজন। বুক ধুকপুক করছে। অন্য একটা বিল্ডার্স আছে বারাসতে, সেটাও ফিউচার বিল্ডার্স। ওখানে যখন যেত, মনে আনন্দ হত। ওখান থেকে বেসিন কিনেছে, কমোড কিনেছে, আয়না...

কমোড ব্যাপারটা রপ্ত হতে বেশ টাইম লেগেছিল। বাপের আমলে তো মাঠেই যেত। শুঁটিয়ার বাড়িতে যখন পায়খানা তৈরি হল, তখন ভজনের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। যখন পুরী গেল, বছর পাঁচ-ছয় আগেকার কথা, হোটেলে কমোড ছিল। কিছুতেই হয় না। পরদিন পারগেটিভ নিতে হল। সেটাই প্রথম কমোড ফুল। তারপরই বাড়ির জন্য কমোড কেনা হল ফিউচার বিল্ডার্স থেকে।

এই ফিউচার বিল্ডার্সে গেলে ক-লাখ টাকা বলবে, কে জানে?

ছেলেটা আজ অন্য জামা পরে এসেছে। বেশ দেখতে ছেলেটাকে। ছেলেটা বলল,—রোজ আসি না। আপনার জন্যই এলাম।

ছেলেটার পাশে অন্য চেয়ারে একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটা দেখতে মন্দ না। আজকাল সব মেয়েই কীরকম যেন একই রকম দেখতে হয়। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে।

ছেলেটা বলল,—নেপালে সাড়ে তেরো লাখে করে দিতে পারি।

ভজন বলল,—আমার সাধ্য নেই।

মেয়েটা এবার মিষ্টি হেসে বলল, সাধ আছে?

ভজনের হ্যাঁ বলতে লজ্জা-লজ্জা করল। সদ্য কিশোরীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়—মেনস শুরু হয়েছে? তখন যেমন করে ঘাড় নাড়ায়, তেমন করেই ঘাড় কাত করল ভজন। ছেলেটা বলল,—তা

হলে টাকা জোগাড় করুন। সামনের বার। একটা জীবনের পক্ষে একটা বছর এমন কিছু বেশি নয়। আরও চার-পাঁচ লাখ টাকা জমিয়ে ফেলুন, সামনের বারে করে দেব।

ভজন বলল,—এই কথা তো ফোনেও বলতে পারতেন। এই কথাটা বলার জন্য এত দূরে টেনে আনার কোনো মানে হয়?

ছেলেটা হাসল।

মেয়েটা বলল, নো কষ্ট, নো কেষ্ট।

বুঝতে সামান্য লেট হল ভজনের। ভজন বলল,—কই কেষ্ট? কেষ্ট মিলল নাকি?

মেয়েটা বলল,—সবুরে মেওয়া ফলে।

ভজন বলল,—সে তো আমি জানি।

ছেলেটা বলল,—আপনি কতটা সিরিয়াস সেটাই দেখছিলাম। যদি সত্যিই সিরিয়াসলি ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে চান তো টাকা জমিয়ে ফেলুন।

জমিয়ে ফেলুন বললেই কি জমানো যায় নাকি! ভজন গজগজ করতে থাকে ভিতরে ভিতরে। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। চুপ করে থাকে ভজন।

—চা খাবেন?

ভজন বলে,—না। ইনজেকশন দেওয়ার পর—ব্যথা লাগল? জিজ্ঞাসা করলে বালক যেমনভাবে না বলে।

ছেলেটা বলল,—মাঝে মাঝে ফোন করে জিজ্ঞাসা করব কত জমল।

৭

রোজগার বাড়ানোর কী উপায়?

ফি বাড়ানো চলবে না। আর ফি বাড়ালে রুগি কমে যাবে। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের দেওয়া স্যাম্পল এমন কিছু বেশি আসছে না। ওরা আজকাল স্যাম্পল কম দিচ্ছে। ফ্লাস্ক, মানিব্যাগ, টি-সেট এইসব গিফট দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, গোয়া-সিমলা—এসব জায়গায় কনফারেন্সের নামে বেড়াতেও নিয়ে যাচ্ছে। বারাসতের অতীন গুপ্ত, এন্তার সুবামাইসিন আর কোরেক্স প্রেসক্রাইব করে। সব কিছুতেই সুবামাইসিন। আর কাশি হলেই কোরেক্স। কোম্পানি থেকে মস্ত বড় ফ্রিজ দিয়েছে। গত বছর শীতকালে ব্যাংকক-পাট্টায়া ঘুরিয়ে এনেছে। পাট্টায়াতে নাকি ন্যাংটো নাচ দেখা যায় সস্তায়। এখন ওষুধ কোম্পানিগুলো ডাক্তারদের কিনে রেখেছে। যার যত প্র্যাকটিস তার দাম তত বেশি। রুগি-সংখ্যার বিচারে ভজনেরও প্র্যাকটিস খারাপ নয়। কিন্তু রুগির সংখ্যায় ভালো প্র্যাকটিসের বিচার চলে না। যে রুগিরা ডাক্তারের কাছে আসছে সেইসব রুগিরা কত ওষুধ কিনছে, কত টাকার ব্যবসা দিচ্ছে সেটাই দেখার। ভজন অম্বল হলে সব চেয়ে সস্তার ওষুধ জিনট্যাক লিখছে। ওর তো গরিব রুগি। জিনট্যাকের দাম চল্লিশ পয়সা। ভজন প্যান ফর্টি লেখে না। সাড়ে ছ-টাকা করে দাম। ভজন তো বেলশুঁট পুরিয়া করে দেয়, হিঞ্চের রস খেতে বলে। আজ যদি অতীন ডাক্তারের ছেলে প্রাইভেট কলেজে ম্যানেজমেন্ট কোটায় ডাক্তারি পড়তে চাইত, তবে হয়তো কোনও ওষুধ কোম্পানিই টাকা দিয়ে দিত। রোজগার বাড়াবার কী উপায়? ভজন বুঝে উঠতে পারে না।

একটা ঘটনা মনে পড়ল ভজনের। বছর তিন আগেকার কথা। চেম্বারে একটা লোক এল। এসে বলল, স্যার একটা প্রাইভেট কথা আছে। তখন বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। চেম্বারে সাত-আট জন রুগি আছে।

ভজন জিজ্ঞাসা করেছিল, কী ব্যাপার? কীসের প্রাইভেট?

লোকটা বলল, আপনার সব পেশেন্ট চলে যাক, তারপর বলব।

ঘণ্টাখানেক বসে রইল লোকটা। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে একটু গলাটা নামিয়ে বলল,—আমি স্যার একটা ব্যবসা করি। কিডনির ব্যবসা। অনেক গরিব লোক আছে, যাদের হঠাৎ টাকার দরকার। কোথাও টাকা পাচ্ছে না। ও কিন্তু তখন তার একটা কিডনি বেচে দিতেই পারে। ভালো টাকা পাবে লোকটা। আপনিও পাবেন স্যার।

ভজন বলে কিডনি বেচা-কেনাটা তো বেআইনি তাই না?

—সে তো কত কিছুই বেআইনি।

—কিডনি ডোনেট করা যায়, বিক্রি করা যায় না।

—এটা ডোনেটই হবে। যার কিডনি সে টাকা পাবে। এমনি এমনি কেউ খামোখা ডোনেট করতে যাবে কেন?

—তো আমি কী করে বুঝব কেউ কিডনি বেচবে কিনা।

—আপনাদের সঙ্গে তো কত লোকের আলাপ-সালাপ হয়। কত লোক আসে...

—তা আসে, কিন্তু কার কিডনি খারাপ হয়ে গেছে, তা হয়তো বুঝতে পারি। কিন্তু কে কিডনি বেচতে চায় সেটা বুঝব কী করে? আর খারাপ কিডনি বেচতে চাইলেও তো বিক্রি হবে না।

—তা হবে না, আসলে মানুষের দুটো কিডনি আছে কিনা, একটাতেই কাজ চলে। একজোড়া করে দেছেন ভগবান। একটা স্পেয়ার। দুটা ফুসফুসের দরকার নাই, একটাতেই চলে। দুটা বিচির দরকার নাই, দুটা কিডনিরও দরকার নাই। একটা না হলে ক্ষতি নাই।

একটা কার্ড দিয়েছিল লোকটা। নাম আর মোবাইল ফোন নম্বর লেখা আছে। বলল, এটা রাখেন। খোঁজ পেলেই জানাবেন। বুঝলেন স্যার, যোগাযোগটাই আসল। এই সময় দেখুন কত লোক বাড়ি চাইছে, আবার কত লোক বসে আছে ঘর ভাড়া দেবে বলে। কাগজের এপাশে লিখছে পাত্র চাই আবার

ওপাশে লিখছে পাত্রী চাই। কিডনিও সেরম, কেউ দিতে চায়, কেউ নিতে চায়। কিন্তু নিতে চাওয়ার লোকই বেশি। ডিম্যান্ড আছে।

কার্ডটা খুঁজছে ভজন। না, কোনো কিডনি বিক্রেতার সন্ধান পায়নি। ও শুধু জানতে চায় টাকার অংক। আসলে ওটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি ভজন। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করতে যাবে, কিডনি বেচবেন? কোনো দরিদ্র রুগিকে ফিসফিস করে বলতে হত—একটা কিডনি বেচে দিন না ভাই, আমি ব্যবস্থা করে দেব। বেশ কিছু টাকা পাবেন।

কিন্তু কত টাকা? লাখ দুই? তাহলে নিজের একটা কিডনি চুপিচুপি ঝেঁপে দেওয়া যায়। কাউকে জানানোর দরকার নেই। শুধু বলা হবে গলব্লাডার অপারেশন। বউকে বলা চলবে না। বউ চেঁচামেচি করবে। বিধবা হওয়ার ভয়।

মনটাকে স্থির করার চেষ্টা করে ভজন। আজকাল টিভিতে রামদেবের প্রাণায়াম দেখে। মাঝেমাঝে প্রাণায়াম করার চেষ্টাও করে। অনুলোম-বিলোম, কপালভাতি। দুই ভ্রূ-র মাঝখানে—মনটাকে স্থির করার চেষ্টা করে ভজন। কিন্তু দুই ভ্রূর মধ্যে একটি কিডনির ছবি ব্রহ্মকমলের মতো ফুটে থাকে। কিডনি।

শরীরের মধ্যে কত টাকার মাল বহন করে চলেছি আমরা। এজন্যই তো বাউল-খ্যাপারা বলেন শরীরে আছে মণিমানিক-গুপ্তধন, ওসব জানতে হয় রে, বুঝতে হয় রে মন। একটা বডিতে ছ-লিটার রক্ত। আড়াইশো সিসি রক্ত নিলে চারদিনের মধ্যেই রক্ত তৈরি হয়ে যায়। হাড়ের ভিতরে নাকি রক্ত তৈরির কারখানা। এসব মদন রানার বইতে লিখেছে। একটা লোক বছরে হেসেখেলে বিশ হাজার টাকার রক্ত বেচতে পারে। দশ বছরে আড়াই লাখ। এই যে বউ-এর বুকে দুটো মাই, এ দিয়ে কী হবে ছাই? এখনে তো ধরতেও ইচ্ছে করে না। ওগুলো বেচা যায় না? কত করে দাম হবে? কাগজে উঠেছে কোনও কোনও ছেলে নাকি মেয়ে হতে চায়। প্লাস্টিক সার্জারি করাচ্ছে। ওদের কাছে বিক্রি করা যায় না? ওরা

কি ঝোলা জিনিস নেবে? তবে ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়। সার্জারির কত উন্নতি হয়ে গেছে। টিসুগুলো তো অরিজিনাল। উরুর মাংস বুকে লাগালে কী আসল জিনিস হয়? আসল টিসু চাই। কোন বইতে যেন লেখা ছিল—ঠোঁট থেকে শুরু করে মুখ, খাদ্যনালী মায় স্টমাক, ইনটেসস্টাইন থেকে এক্কেবারে পায়ুদ্বার পর্যন্ত এক জাতের টিসু দিয়ে তৈরি। ঠোঁটের টিস্যু আর পাইখানা করার জায়গাটার টিসু নাকি সেম। কারুর যদি ঠোঁট পুড়ে যায়, সেখানে পোঁদের চামড়া গ্রাফটিং করে দেওয়া যায়।

কত যে বিজনেস আসছে সামনে। শরীরের স্পেয়ার বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। কেউ হয়তো কোনো লোককে পুষে রেখে দেবে। তাকে রোজ উরুখকলাই ভেজানো জল খাওয়ানো হবে কিডনি ভালো রাখার জন্য। দরকার মতো কিডনি সাপ্লাই হয়ে যাবে, গরম গরম। কাউকে রোজ রোজ পদ্মগুলঞ্চের রস, কালোমেঘ পাতার বড়ি খাওয়ানো হবে রেগুলার। কোয়ালিটি লিভার। একদম এ-গ্রেড লিভার সাপ্লাই হবে। বলা হবে, এ লিভারে কোনওদিন অ্যালকোহল ঢোকেনি। কালোমেঘ খাওয়া আয়ুর্বেদিক লিভার। বায়ো-প্রোডাক্ট।

নিজের একটা কিডনি বেচার কথা ভাবছে ভজন, কিন্তু ভনভন করা মাছি। সব বিক্ষিপ্ত চিন্তা। সিরিয়াসলি নিজের কিডনিটার কথা ভাবতে থাকে ভজন। কিডনির অপর নাম বৃক্ক। ধন্বন্তরি মেডিকেল কলেজে যিনি পড়াতেন, তিনি বৃক্ক উচ্চারণ করতে পারতেন না। বলতেন বিক্ক। বোর্ডে ছবি এঁকে বোঝাতেন। ডাক্তার স্বপন পালের সচিত্র অ্যালোপ্যাথিক শিক্ষা বইটাতে কিডনির কার্য পড়েছিল ভজন। নেফ্রন-এর কার্যপদ্ধতি পড়েছিল। কিডনিতে পাথর জমে। এক্স-রে করলে পাথর বোঝা যায়। খুব জল খেতে হয়, আর হোমিওপ্যাথিক ফাইটোকক্কাস ওষুধ দিতে হয়। কুলত্থকলাইয়ের জল আর হিমালয়ান ড্রাগস কোম্পানির সিসটোন বড়ি। কিডনি খারাপ হয়ে পা ফোলা দেখা দিলে ওই রোগী হাতে রাখতে নেই। চোখ বুঁজে ফেলে ভজন। পিঠের দিকে মেরুদণ্ডের দু-পাশে দুটো পদ্মকুড়ির মতো কিডনি। কত দাম হবে নিজের কিডনি দুটোর।

দুটো কেন? দুটো বেচে দিলে নিজের কী থাকবে? একটা। কত দাম হবে?

লাখ দুয়েক।

কলকাতার ফ্ল্যাটের বুকিং মানি + জমানো টাকা + বউ-এর গয়না + নিজের একটা কিডনি = নেপালে ডাক্তারি পড়া হবে তো? হিসেব মেলে না।

নিজে বেচতে গেলে ভালো দাম পাওয়া যায় না। কোনও জিনিসেরই নয়। কেউ যদি কিনতে আসে, নিজের মালের বেশি দাম চাওয়া যায়? এখন যদি ওই কিডনির দালালের কাছে গিয়ে বলা হয়—নিজের কিডনিটা বেচব, ওইসব ঘাঘুমাল এমন ভাব দেখাবে যেন এখন দরকার-টরকার নেই, আচ্ছা, বলছ যখন কিনছি..। আর ভজনের যা রোগীপত্তর, বা ওর যা পরিচিত গণ্ডি, ওখানে সব গরিব-গুরবোর দল। কে-ই বা দু-চার লাখ দিয়ে কিনবে?

মনে মনে এলাকার এমএলএ-র কথা ভাবে। এমএলএ সাহেবের কিডনিটা যদি মহান ভগবানের দয়ায় খারাপ হয়ে যায়, আর যদি এক্ষুনি দরকার হয়, আর সেই খবর যদি ভজন পেয়ে যায়, তবে লাখ দশেক দর হাঁকা যেতেই পারে। একজন এমএলএ-র জীবনের দাম অনেক বেশি। ওদের টাকা ভূতে জোগায়। ভূত কেন? জনগণ। জনগণ কিংবা ভূত। ইশ, যদি একটা এমএলএ খদ্দের জুটে যায়, তবে কিডনিটা দিয়ে-দি...।

চুপচাপ বসে আছে ভজন। একটা বাক্সের মধ্যে সব কার্ডটার্ড রাখে। বেশিরভাগ কার্ডই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের।

ওরই মধ্যে কোথাও কিডনির দালালের কার্ডটা আছে। কার্ডের বাক্সটা সামনে নিয়ে বসেই আছে। আসলে কিন্তু খুঁজছে না কার্ডটা। প্রকৃত প্রস্তাবে খুঁজছে না কার্ডটা, খোঁজার ভান করছে। আসলে পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্য এবং নিজস্ব শরীরের প্রতি নিজের কর্তব্য—এই দ্বন্দ্ব ওকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে।

মনে হল কর্তব্যে অবহেলা হচ্ছে। কার্ডটা খোঁজায় গাফিলতি হচ্ছে। মন দিয়ে কার্ডটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু কী নাম? কার কার্ড খুঁজবে? নামটাই তো মনে পড়ছে না। অনেকগুলো কার্ড পাওয়া গেল। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের, প্যাথোলজি ক্লিনিকের, সিমেন্ট বালি সাপ্লায়ার বিল্ডার্সদের, কেরিয়ার বিল্ডার্সের, ম্যাসাজ ক্লিনিক, ফিজিওথেরাপিস্ট, জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, ফকির বাবা, বাস্তুবিদ...কিছু কার্ডে শুধু নাম। লোকটার কার্ডে শুধু নামই তো ছিল। নিশ্চয়ই ওখানে লেখা ছিল না কিডনি মার্চেন্ট...।

যাক!

তাহলে কিডনিটা বেঁচেই গেল।

বাক্সটা বন্ধ করবার উপক্রম করতেই একটা কার্ড চোখে পড়ে ভজনের। কার্ডের উপরে লেখা 'কিডনি'। ভজনেরই হাতের লেখা।

কার্ডটা নিতেই হয়।

নিত্যানন্দ পাড়ুই।

অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

তখন কার্ডটা ভালো করে পড়েইনি ভজন। পাছে অন্য কার্ডের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভুলে যায়, তাই পেন দিয়ে কার্ডের কোনায় 'কিডনি' শব্দটা লিখে রেখেছিল।

ওই কার্ডটা হাতে পেয়ে গিয়ে এবার ঝামেলায় পড়ে গেল ভজন। কার্ড যখন পাওয়াই গেল, তাহলে তো ফোনটা করতেই হয়। করা যাবে। একটু পরে।

সামান্য বিছানায় চিৎ হল ভজন। নিত্যানন্দ পাড়ুইকে স্বপ্ন দেখল। অর্ডার সাপ্লায়ার্স। নিত্যানন্দ বলছে—কিডনি বেচবেন? ভেরি গুড। আগামী রবিবার আমার বাড়ির ছাদে কিডনিমেলা বসিয়েছি, ওই মেলায় আসুন...। ওখানে কথা হবে।

কিডনি মেলা।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওখানে কী হবে?

যারা কিডনি বেচবে, আসবে, আমি পছন্দমতো কিডনি বুক করব।

বাবা, এত লোক বেচতে আসে? হ্যাঁ। খুব ডিমান্ড তো।

আমি তো কিডনি এক্সপোর্ট করি।

খুব লাভ?

লাভ মানে? খুব। লাল হয়ে গেছি। ভজন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ফস করে বলে দেয়—স্যার, আমাকেও নেবেন?

আপনি বিজনেস পার্টনার হবেন? ভালোই তো। একজন ডাক্তারকে সঙ্গে পেলে ভালোই তো। হোক না কোয়াক ডাক্তার, আসুন তাহলে।

স্বপ্নের দ্বিতীয় চ্যাপটারে দেখা যাচ্ছে, ডা. ভজন মৃধা এবং নিত্যানন্দ পাড়ুই। ট্যাক্সিতে যাচ্ছে বেলেঘাটা অঞ্চল দিয়ে। একটা বস্তির সামনে ট্যাক্সিটা থামল। নিত্যানন্দ পাড়ুই বুকপকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। কাগজে একটা খবরের কাগজের টুকরো। ওখানে লেখা একটি O+ কিডনি বিক্রয়কারীর নাম। সুকুমার দাস। ১৬/৪/৩A চালতা বাগান। নিত্যানন্দ বলছে,—এরকম ঠিকানা খুঁজে বের করা বেশ মুশকিল। ওরা খুঁজছে। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটা বলল,—কিডনি খুঁজছেন?

পাড়ুই বলল,—হ্যাঁ। তুমিই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলে বুঝি?

ছেলেটা বলল,—আমার বিজ্ঞাপন দেওয়ার পয়সা নেই। তবে আমারও একটা কিডনি বিক্রি আছে।

মানে?

মানে আবার কী? যে পয়সা খরচা করে অ্যাডভাটাইজ দিয়েছিল সে ভিতরের শোকেস-এ বসে আছে। আমি ফুটপাথে হকারি করছি।

নিত্যানন্দ বলল,—বেছে নিতে পারলে ফুটপাথেও ভালো মাল পাওয়া যায়। তোমার কী গুরুপ? আমার স্যার বি প্লাস।

কত দেবে?

বেশি বলব না। এক লাখ। নিত্যানন্দ বলল,—দাঁড়াও, ওটা আগে দেখে আসি।

নিত্যানন্দের পিছনেই ভজন। একটা শেওলা ধরা উঠোন পার হয়ে একটা বারান্দার সামনে দাঁড়াল। একটা ছেলে চেয়ারে বসে আছে। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল নিত্যানন্দই—

—মাল আছে?

—হ্যাঁ।

—কী গুরুপ?

—বি প্লাস।

—কতয় ছাড়চ?

—এক থাবড়া।

—এক? কিছু কম করো। বাইরে এর চেয়ে কমে পাওয়া যাচ্ছে।

ভজন দেখল বাইরের ছেলেটা ভিতরে চলে এসেছে। উঠোনের সবুজ শেওলায় দাঁড়িয়ে বলছে আমি আশি হাজারে দিয়ে দেব। চেয়ারের ছেলেটা বলে , বাইরের মালের কোনো গ্রান্টি নেই কিন্তু। চুল্লু খাওয়া কিডনি নেবেন না। আমি রেগুলার নেবু-জল খাই। হিঞ্চেসেদ্ধ খাই। ছেলেটা বলে উঠল, হিসু চেক করে নেবেন স্যার। আপনাদের সামনে দুজনকে মুততে বলুন, চেক করে নিন কার মুত বেশি সাদা।

চেয়ারের ছেলেটা বলল,—বডি ঠিক রাখার জন্য ভিটামিন বি ক্যাপসুল খাই ওই জন্য আমার ইউরিন একটু ইয়োলো হয়। ও কিছু না।

—ও কিছু না বললে হবে? ড্যামেজ কিডনি। আমি কাগজে অ্যাডভাটাইজ করতে পারিনি, কিন্তু আমার একদম ফিট কিডনি। ঠিক আছে পঁচাত্তর হাজার।

—বাহাত্তর।

—সত্তর।

—পয়ষট্টি।

—পঞ্চাশ।

—আমি তিরিশেই দিয়ে দেব।

তিরিশ হাজার এক...

তিরিশ হাজার দুই...

তিরিশ হাজার তিন...

আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যায় ভজন মৃধার। কিডনির দাম কীভাবে কমে যাচ্ছে। নিলাম নয়, উলটো নিলাম। বিশ্ববাজারে সেনসেক্স ফল করছে না, অথচ কিডনির দাম কমে যাচ্ছে। তাহলে নিজের দামও যে কমে যায়। তাহলে ছেলে, ছেলের ডাক্তারি পড়া? এতদিন ধারণা ছিল পিঠের খাঁচার ভিতরে দু-লাখ টাকার মাল ডিপোজিট আছে। কিন্তু সেই মালের ডাউনফল আশা করেনি। ঘুম ভাঙলে মনে হল এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, দিবাস্বপ্ন, তাহলে খুব বাঁচা বাঁচা গেল। দিনে-দুপুরে এরকম স্বপ্ন দেখা ভালো নয়। হোমিওপ্যাথিতে আছে—দিবাভাগে উদ্ভট স্বপ্ন দেখিলে ক্যান্থারিস—৩০।

জলটল খেল ভজন ডাক্তার, চোখেমুখে জলের ছিটে দিল।

হাতে নিত্যানন্দ পাড়ুই-এর ওই কার্ড। ফোনটা করে ফেলা যাক। ফোন করতে গিয়ে মনে হয়, এতদিনে যদি মোবাইল নম্বরটা পালটে গিয়ে থাকে তা হলে মন্দ হয় না। নিজের কাছে ক্লিয়ার। ফোন করা

হয়েছিল, কিন্তু পাওয়া যায়নি। ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল। তাহলে ফোনটা করতেই হয়। কর্ম করো, ফল চেয়ো না। কর্মই ধর্ম। সুতরাং টেলিফোন কর্মটি করতেই হল।

রিং বাজছে। মেহবুবা মেহবুবা রিংটোন।

—নিউ সান কনসালটেন্সি...।

যাক। নম্বরটা পালটে গেছে তাহলে। ভজন যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। বলুন কাকে চান...

—বোধহয় রং নাম্বার হয়ে গেছে। আমি নিত্যানন্দ পাড়ুই নামে একজনকে খুঁজছিলাম...।

—ইসপিকিং। আমিই পাড়ুই বলছি, হু আর ইউ ইসপিকিং প্লিজ!

—আমি ডাক্তার মৃধা। শুঁটিয়া, শুঁটিয়া, বামনগাছি। বামনগাছি মানে নিয়ার বারাসাত। আপনি এসেছিলেন একবার, তা বেশ কিছুদিন হয়ে গেল...

—ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু খবর আছে? সরি স্যার, আমি এরপরে আর ফলো আপ করতে পারিনি। বলুন স্যার!

—বলছি কী, আমার একটা কিডনি যদি বেচে দি, কীরকম দাম হতে পারে?

—হ্যাঃ, কী বলছেন স্যার? কেন? আপনার হঠাৎ এত কী অভাব হয়ে গেল?

—অভাব নেই নিত্যানন্দবাবু, কিন্তু একটা স্বপ্ন আছে, বুঝলেন! নিজে ঠিকমতো ডাক্তার হতে পারিনি তো, তাই ছেলেকে ডাক্তার করতে চাইছিলাম। আপনাকে সত্যি কথাটাই বলছি। এমনি জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে ও পাবে না। বাইরের প্রাইভেট কলেজে ম্যানেজমেন্ট কোটায় ভরতি করাব ভাবছিলাম। অনেক খরচ। তাই আমি আমার স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কত হিসেব করছিলাম। কিডনিটা কি স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পড়ে?

—শিয়োর স্যার। নিশ্চয়ই স্যার। কিডনি তো আপনার সম্পত্তিই। একটা তো বেচেই দিতে পারেন। কিন্তু নিজেরটা বেচতে যাবেন কেন? দুটো আছে, থাক না। একটা যদি ফেল করে অন্যটা কাজে

লাগবে। কিন্তু একটা যদি আগেই বেচে দেন। তখন অন্য মালটা ব্যাগড়বাই করলে আপনার কিছু করার থাকবে না। তাই বলছিলাম—আপনারটা আপনারই থাক। আপনি বরং অন্যের মাল সাপ্লাই করুন।

—না, মানে বলছি কী, নিজের মাল থাকতে অন্যের মাল...মানে আগে নিজের প্রপার্টি বেচে তারপর অন্য প্রপার্টির কথা ভাবছিলাম আর কী। বলছিলাম কী, আমার টেসটিস দুটো কোনো কাজে লাগে না, ওটাও কি বেচা যায়?

ডাক্তার হয়ে এ কী বলছেন? ওটার হয় তো এক্সপায়ারি ডেট হয়ে গেছে। ওটার কোনো বাজারদর নেই।

তা অবশ্য ঠিক, এই প্রশ্নটাই ঠিক হয়নি। তবে ওই নিত্যানন্দ পাড়ুইও পুরো জানে না। ওই যন্ত্রটার কোনো এক্সপায়ারি ডেট নেই। নিত্যান্দ বলল,—আমি যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার টাকার অভাব হবে না। টাকা উড়ছে। শুধু ধরতে জানতে হবে।

৮

নিত্যানন্দ পাড়ুই আর আগের মতো নেই। দেখতে-শুনতে অন্যরকম হয়ে গেছে। ওর পরনে সাফারি সুট। চোখের কালো চশমায় গাছপালার ছবি। পকেটে সিগারেটের প্যাকেট। লম্বা সিগারেট। বেশি পাউডার ঢেলেছিল বলে গলায় সাদা ছোপ।

চেম্বারে রোগীপত্তর আছে বলে বাইরে এসেই কথাটা হচ্ছে। একটা বড় অশ্বত্থ-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ভজনের প্রায় গা-ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে নিত্যানন্দ। প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছে। বোঝাই যাচ্ছে গোপন কথা হচ্ছে।

নিত্যানন্দ—কী আছে? অতশত ভাবলে চলে না।

ভজন মাথা চুলকোচ্ছে। বলছে ভেবে দেখি। নিত্যানন্দ বলছে, ভাববার কী আছে? কাজ শুরু করে দিন। ভজন বলছে, লোকে জানতে পারলে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে।

—আরে ধুৎ, জানবে কী করে?

—যদি কখনও পেট স্ক্যান করায় কেউ, তখন ধরা পড়ে যাবে না যে একটা কিডনি নেই...

আরে ধুর, স্ক্যান কে করাবে?

টারগেট তো হবে রিকশাওলা কিংবা ছোটখাটো শ্রমিকরা। মেয়ের বিয়ে দেবার সময় ওরা টাকা খোঁজ করে। ওদের তো জমিজমা থাকে না যে বেচে মেয়ের বিয়ে দেবে। ওদের তো সেই কী বলে—অ্যাওয়ারনেস নেই যে নিজের একটা কিডনি বেচে দেবে। ওদের মাথায় সেই বুদ্ধিটা দিতে হবে। তক্কে তক্কে থাকবেন ডাক্তারবাবু। ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, মেয়ের বে-থার কী করলে—এসব জিজ্ঞাসা করতে করতে ওদের মাথায় অ্যাওয়ারনেসটা পুশ করে দেবেন। ওরা তো পরে আর স্ক্যান করাতে যাচ্ছে না। একটা কিডনি নিয়ে এরপর যদ্দিন বাঁচে বেঁচে থাকবে। ভয় পাবেন না, কাজে নেমে যান।

মাথা চুলকোচ্ছে ভজন। ঘাড় নাড়াচ্ছে। এই ঘাড় নাড়ানো সম্মতির চিহ্ন নয়।

নিত্যানন্দর আরও বক্তব্য ছিল, খামোখা নিজের কিডনি বেচতে যাবেন কেন? পৃথিবীতে কিডনির কমতি পড়েছে নাকি? অন্যের কিডনি পাঠিয়ে দিন। তারপর একটা বুদ্ধি দিয়েছিল নিত্যানন্দ।

শুনুন ডাক্তার মৃধা, মনে করুন কেউ আপনার কাছে পেটব্যথার কেস নিয়ে এল। আপনি কায়দা করে বললেন, অপারেশন কেস। আপনি সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, মানে রেফার করে দিলেন। সার্জন তখন একটা নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিল, ওখানেই কিডনিটা কালেকশান হয়ে যাবে। নার্সিং হোমগুলোর নাম-টাম সব বলে দেব। পাক্কা কাজ। একেকটা কেস-এ বিশ-পঁচিশ হাজার কমসে কম পাবেন ।

প্রথমে বুঝতে পারেনি ভজন ডাক্তার। ব্যাপারটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারল। বলা হচ্ছে—অ্যাপেন্ডিসাইটিস, বা গলস্টোন, বা গ্যাসট্রিক আলসারের নামে পেট কাটা হবে এবং পেট কেটে একটা কিডনি টুক করে চুরি করে নেওয়া হবে। লোকটা জানতেই পারবে না ওর কিডনি ঝেড়ে দেওয়া হল।

এরকম যে হয়, কানাঘুষোয় শুনেছিল ভজন। কিন্তু ওকেই কেউ এরকম প্রস্তাব দেবে ভাবতে পারেনি। নিত্যানন্দ আরও বলেছিল—ফিটাস-এর খবর থাকলেও বলবেন। টুয়েনটি সেভেন উইকস অ্যান্ড অ্যাবাভ। বেশ ভালো দাম পাবেন। শুনেছি স্টেম সেলের রিসার্চের কাজে লাগে। স্টেম সেল বোঝেন? ভজন বোঝে না।

নিত্যানন্দ বোঝে না। ও শুধু এটুকুই জানে বেশ পরিণত হয়ে যাওয়া ভ্রূণের বাজারদর বেশ ভালো। ডিমান্ড আছে। ভালো দাম পাওয়া যাবে।

নিত্যানন্দবাবু চলে গেল। ভজন ওকে ঠিকমতো কথা দিতে পারল না। কতরকমের বিজনেস আছে পৃথিবীতে। গদাধর দোলুই স্রেফ মুত বেচে বড়লোক হয়ে গেল। ও অর্গানন কোম্পানিতে ইউরিন সাপ্লাইয়ের কনট্রাক্ট নিয়েছিল। অর্গানন কোম্পানিটা হল মধ্যমগ্রামের কাছে। ওরা কনট্রাসেপটিভ তৈরি করে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট। ওই ওষুধ তৈরি করতে দুটো হরমোন দরকার হয়। ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন। এই হরমোন পাওয়া যায় গর্ভবতী মহিলাদের প্রস্রাবের মধ্যে। গদাধর সাইকেলের পিছনে জারিকেন বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পেচ্ছাপ সংগ্রহ করত। রেললাইনের ধারে যে ঝুপড়িগুলো, সেখানে ভালো বিজনেস ছিল গদাধরের। সারাদিনের পেচ্ছাপ রেখে দিত ওরা, গদাধর জারিকেন ভরে নিত। পেচ্ছাপের জন্য টাকাও পেত গর্ভবতীরা। আর পেচ্ছাপ বেচবে বলে বারবার গর্ভবতী হত ঝুপড়ির বউরা। কিন্তু বাচ্চা করত না, কিছুদিন পরই পেট খসাত। আবার গর্ভবতী হত। একেই বলে ডাউনস্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রি। খবর কাগজে লেখে না? একটা শিল্প তৈরি হলে তার সহযোগী কিছু শিল্প তৈরি

হয়ে যায়। একদম চেন সিস্টেম। যেমন—কারখানা হল, কাঁচামাল হিসেবে গর্ভবতী নারীর পেচ্ছাপ দরকার হল। সেইজন্য মেয়েরা কাঁচামাল সাপ্লাই করার প্রয়োজনে গর্ভবতী হতে লাগল। বারবার গর্ভবতী হওয়ার জন্য পেট খসাতে লাগল, এজন্য আবার নার্সিং হোম-ইন্ডাস্ট্রি বেড়ে গেল। নার্সিং হোম গজালেই ওষুধের দোকান, চা-পাউরুটি-ঘুগনির দোকান। ছোট ছোট নার্সিং হোম তো। বড় নার্সিং হোমের সামনে হয় কেক বার্গারের দোকান। এখানে চা পাউরুটি ঘুগনি আলুর দম। কত লোকের রোজগার ভাবুন। আবার রাস্তায় চায়ের দোকান হলে দোকানদার ছাড়াও কিছু লোকের অন্ন সংস্থান হয়—যারা তোলা তোলে। প্রত্যেক চায়ের দোকানদারকে হপ্তা দিতে হয়। ব্যাপারটা চেন সিস্টেম। আবার গর্ভবতী হতে হলে তো একটা বিয়ে করতেই হবে। কুমারী অবস্থায় মা হলে পেচ্ছাপে ইস্ট্রোজেন বা প্রোজেস্টেরন কম পড়ে না ঠিকই, কিন্তু পাবলিক মানে না। তাই বিয়ের রেটও বেড়ে যায়। বিয়ে বেড়ে গেলে পুরোহিতের দু-পয়সা হয়, শোলাশিল্পীদের দু-পয়সা হয়, রান্নার ঠাকুরের দু-পয়সা হয়।

সাত-আট বছর চুটিয়ে বিজনেস করেছে গদাধর। কর্মচারীও রেখেছিল, যারা দূর গ্রাম থেকে জিনিসটা নিয়ে আসত।

তারপর ওই কোম্পানি সিন্থেটিক উপায়ে হরমোন তৈরি করার কাদয়া শিখে গেল, তখন প্রাকৃতিক উপায়ে পাওয়া জিনিসটার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল।

এখন পেচ্ছাপ নয়, জ্যান্ত ভ্রূণ কিনতে চাইছে। সাত মাসের, আট মাসের...। সিজার করে বার করে দিলে একদম হাতে গরম। জ্যান্ত জিনিসের বোধহয় দাম বেশি।

সেই রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখল ভজন ডাক্তার।

ওর মেয়ের দিকে জুলজুল করে তাকাচ্ছে ভজন। কোনো পিতা নিজের কন্যার দিকে এভাবে তাকায় না।

ভজনের মনে হল ওর মেয়েটি গর্ভবতী। পেটটা যেন বড় বড় লাগছে। বেশ আনন্দ হচ্ছে মনে।

স্বপ্নের তৃতীয় বা চতুর্থ চ্যাপটারে নিজের মেয়ের পেট কাটছে ভজন। ট্রে-র মধ্যে সাত মাসের গোলাপি গোলাপি ভ্রূণ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে নাইলনের বাজারের থলে হাতে নিত্যানন্দ পাড়ুই। খপ করে ধরে বাজারের ব্যাগে পুরে নিল নরম ভ্রূণটিকে।

আর পকেট থেকে বের করল একতাড়া ময়লা নোট।

ওই টাকাগুলো দিয়ে ছেলের ডাক্তারি পড়া হবে।

রাত্রে ভজনের বউ ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। বলল,—এত না-না-না বলছ কেন ঘুমের ঘোরে?

৯

অ্যাসোসিয়েশন অফ প্র্যাকটিসিং ডকটরস নামে একটা সংগঠন আছে। আসলে এটা হল কোয়াক ডাক্তারদের সংগঠন। অনেকে বলেন কোয়াক ডাক্তার বলে কোনো কথা হয় না। কোয়াক কখনও ডাক্তার হয় না। কোয়াকদের বাংলায় বলে হাতুড়ে। হাতুড়ে কেন বলে কে জানে? হাতুড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই হয়তো। হাতুড়েদের সম্মেলন চলছে। ডা. আনসারউদ্দিন বারি বক্তৃতা করছেন। মাথায় ফেজ টুপি।

সরকার যখন ব্যর্থ, হাসপাতালের মধ্যে কুকুর বিড়ালে শিশুর গা খুবলে খায়, যুবতি মেয়ে হাসপাতালে যেতে ভয় পায় কারণ, কর্মচারীরা যৌবন খুবলে নেয়, ডাক্তার থাকে না, ওষুধ থাকে না। একেবারে দোজখ। নরক। মানুষ যাবে ক'নে? পাশ করা ডাক্তারগুলান চেম্বার সাজিয়ে বসে আছে, তারা সব এক-একটা শকুন। লোভ ওদের এমন করেছে। লোভের কোনো শেষ নাই। পঞ্চাশ টাকার কমে কোনো ভিজিট নাই। আমাদের দেশের লোকের সারাদিনের ইনকাম তিরিশ টাকাও হয় না, আর ওরা একবার রুগির বুকে চাকতি লাগিয়ে আর দুবার পেট টিপে পঞ্চাশ টাকা হাতিয়ে নেচ্ছে...

আনসারুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আলাপ আছে ভজনের। উনি গরুর ডাক্তারিও করেন। সামনেই একজন বসে আছে, মাথায় প্রায় জটা। উনি তাবিজ-কবচও দেন আবার ইনজেকশনও দেন। ইনজেকশন ফুঁড়বার আগে মন্ত্র পড়ে দেন। ওঁর চোখ দিয়ে নাকি এক্স-রে বের হয়। বাইরে থেকে দেখেই বুঝতে পারেন ভিতরে হাড় ভেঙেছে কিনা। যদি বোঝেন হাড় ভেঙেছে, হাড়ভাঙা লতা বেটে ব্যান্ডেজ করে দেন। টিবি হয়েছে কিনা, তাও নাকি বুঝতে পারেন। বুকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই বলে দেন, 'তোর বুকের কাঠিতে পোকা ধরেছে র‍্যা...।'

দাবি উঠেছে—এইসব ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে। যদি রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়, তবে এরা আরএমপি কথাটা লিখতে পারবে। 'রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার।' আইএমএ, এদের স্বীকৃতি দেওয়ার বিপক্ষে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলও এদের বিপক্ষে।

একজন বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তিনি ডাক্তার নন। রাজনৈতিক নেতা।

এই নেতাটি আইএমএ-র বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

বলছেন—কতজন মানুষ এমবিবিএস পড়তে পারে? গরিব ঘরের সন্তানরা ওই স্বপ্ন দেখতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে ডাক্তার দরকার। অনেক ডাক্তার দরকার। এখন আমাদের দেশে প্রতি ১৪০০ মানুষ পিছু একজন ডাক্তার আছে। ওটা হওয়া উচিত ৪০০ মানুষ পিছু একজন ডাক্তার। একথা মাথায় রেখেই পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার তিন বছরের একটা মেডিকেল কোর্স তৈরি করেছিল। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার কাজ এমবিবিএস-রা করবে না। এমবিবিএস-রা অহংকারী, ওরা সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গী নয়। ওই জন্যই তিন বছরের কোর্স। খালি-পায়ের ডাক্তার। কিন্তু বড়লোকের দালাল আইএমসি, প্রতিক্রিয়া চক্রের স্বার্থরক্ষাকারী আইএমএ ওই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের অনেক ডাক্তার প্রয়োজন। আপনাদের মতো অনেকেই আছেন কোনো মেডিকেল কলেজে না-পড়েই চিকিৎসা করছেন। আপনাদের

অভিজ্ঞতা আছে, সেবা করার মনোভাব আছে। আপনাদের কিছুটা ট্রেনিং দিয়ে, কিছুটা থিয়োরি পড়িয়ে যদি একটা সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, সেটা সমাজের পক্ষে ভালো হবে। জানি এমবিবিএস লবি এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেবে, কিন্তু আপনাদের লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে।

এমবিবিএস-দের যখন গালাগাল দেওয়া হয়, বেশ ভালো লাগত ভজনের। কিন্তু এখন ভালো লাগছে না। কোথায় যেন অস্বস্তি হচ্ছে। ওর সুবোধ তো এমবিবিএস হয়নি, হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। তবু গায়ে লাগে। প্রতিনিধিদের সবাইকে একটা করে কুপন দেওয়া হয়েছিল। কুপনটা দেখালে লক্ষ্মীবিলাস হোটেলে ভাত আর মুরগির মাংস।

কুপনটা আগে দেখেনি ভজন। এখন দেখল। কুপনের গায়ে লেখা—দুপুরের খাবার স্পনসর করলেন—নিত্যানন্দ পাড়ুই।

১০

খবরের কাগজে বের হল—হাতুড়ের চিকিৎসায় যুবকের মৃত্যু। গণপ্রহারে হাতুড়ের অবস্থা সংকটজনক। গণপ্রহারে নিবারণ মণ্ডল নামে এক হাতুড়ের অবস্থা সংকটজনক। তাঁকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কুলপিতে ওই হাতুড়ে চিকিৎসা করতেন। ছাব্বিশ বছরের যুবক আতর সাঁই জন্ডিসে ভুগছিলেন। ওই হাতুড়ের কাছে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন এবং অচিরেই ভালো হয়ে যাবে এই স্তোকবাক্য দিচ্ছিলেন। গত শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। আতর সাঁই ছিলেন ভ্যানরিকশা চালক। তাঁর মৃত্যুর পর কিছু ভ্যানরিকশা চালক এবং স্থানীয় মানুষ ওই হাতুড়ের বাড়িতে হামলা চালায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিবারণ মণ্ডলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কুলপি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ডাক্তার নেই। ওখানে হাতুড়েদেরই দৌরাত্ম্য।

পড়ল ভজন। ডাক্তার শব্দটা একবারও উচ্চারিত হল না। হাতুড়ে। এমবিবিএস-দের চিকিৎসায় যেন লোক মরে না।

পরেরদিনও কাগজে এই ধরনের একটা খবর। একটা বড় আর্টিকেল বেরিয়েছে—পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা বড় লেখা।

‘ডাক্তারি পড়তে যারা আসে, তারা নানারকম উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। কেউ আসে তাদের বাবা, কাকা ডাক্তার বলে, কেউ আসে জয়েন্টে ভালো নম্বর পেয়েছে বলে, কেউ আসে সম্মানের জন্য, কেউ আসে অর্থের জন্য। সবচেয়ে কম আসে, বা আসেই না—মানুষের সেবা করব এই উদ্দেশ্য নিয়ে। সামান্য কিছু আসে চিকিৎসাটা ভালোবাসে বলে, কেউ আসে অন্যতর প্রতিজ্ঞা নিয়ে, যেমন ওয়াকসম্যান। যক্ষ্মা রোগের ওষুধ স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কর্তা ওয়াকসম্যান জন্মেছিলেন ইউক্রেনে। দারিদ্র্যপীড়িত এই পরিবারে ওয়াকসম্যানের ছোটবোন যক্ষ্মারোগে তিল তিল করে মারা যায়। বোনের মৃত্যুর পর ওয়াকসম্যান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—একদিন যক্ষ্মারোগের ওষুধ আবিষ্কার করবেন। ডাক্তারি পড়েছিলেন, কিন্তু করেছিলেন গবেষণা। এখন কি এভাবে ডাক্তার আসে?

যে-সব ডাক্তার আমরা পাই, তাঁরা কতটা প্রতিবাদী? যে-সব ওষুধ তাঁরা লেখেন, তাঁরা জানেন এর বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয়? তবুও লেখেন। কারণ, ওষুধ কোম্পানিগুলির প্রলোভন থাকে। ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি নানা ভেট পাঠায় ডাক্তারদের। অনেক ডাক্তারদের প্রায় কিনে রাখে।

বহুকাল আগে জয়সুখলাল হাতির নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, কতগুলি অত্যাবশ্যক ওষুধ বেধে দেওয়া যায়, যাতে গরিব দেশের মানুষেরা নিত্যনতুন ওষুধের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু কিছু লাভ হয়নি। বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্ষমতা অপরিসীম। তবে বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলির উপর সরকারের যা নজরদারি আছে, আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশে

গোটা স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপরই কোনও নজরদারি নেই। বিহার-উত্তরপ্রদেশের বড় বড় ওষুদের দোকানে সিল করা বোতলে পাওয়া যায় গরুর মূত্র। সারা দেশে হাতুড়েগুলো যা খুশি তাই করছে।

বেশ কিছুদিন দেশে এমএলএফ ডাক্তাররা ছিলেন। এমবিবিএস-এর তুলনায় ওই ডিগ্রি কিছুটা খাটো। কিন্তু তাঁরা ছিলেন খুবই দায়িত্বশীল। তাঁরা কোনও ভুল করলে অনুতপ্ত হতেন এবং ভুলের কারণ খুঁজতেন। সেই ভুল থেকে শিক্ষালাভ করতেন, এখন ডাক্তার ভুল করলে আর একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আগের ভুলটা ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা হয়। বিদেশে, প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই ডাক্তাদের কিছুদিন পরপরই নিজেকে আধুনিক করতে হয়। এতে ডাক্তাররা আধুনিক থাকেন। আমাদের দেশে এরকম কোনও কোর্স চালু করতে হলে এই শিক্ষা কে দেবে তাই নিয়ে রাজনৈতিক দলাদলি, মারামারি, পার্টিবাজি শুরু হয়ে যাবে। রাজনৈতিক দলবাজি এবং গোষ্ঠীবাজি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যেখানে একজন মানুষের মধ্যে যে আত্মজিজ্ঞাসা থাকে, সেটাও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে-র এথিকস-এ আছে কোনও রোগীর ওপর কোনও ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, যদি আমার বা আমার কোনও প্রিয়জনের এই অসুখ হত, তখন আমি কী করতাম?

আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গর্ব হতে পারতেন যে বাঙালি চিকিৎসক সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যিনি প্রথম টেস্ট টিউব বেবি করেছিলেন আমাদের দেশে, তিনি অবহেলিত, অপমানিত হয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। যেখানে ওই ডাক্তারকে নিয়ে দেশ গর্ব করতে পারত, একজন অজ্ঞ মন্ত্রী এবং তাঁর অর্ধশিক্ষিত পরামর্শদাতারা ডাক্তারটিকে খুন করে দিল। এবং পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবসাটা চলছে কমিশনের ওপরে। হাতুড়ে ভূতুড়ে থেকে নামীদামি ডাক্তার সবাই কমিশন কামাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু সৎ ডাক্তার আছেন। তাঁরা বিবেক জাগ্রত রেখেছেন। কিন্তু ওদের করার কিছু নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থায় যেটা স্তম্ভ ছিল, সরকারি হাসপাতাল, তার অধঃপতনই আজকের নৈরাজ্যের কারণ। সরকার ব্যবস্থাটা ঠিক না করে ডাক্তার ডাক্তারে ঝগড়া বাধাচ্ছে। ডাক্তারদের ভিতরে পাঁচরকম অ্যাসোসিয়েশন গড়ে

তুলছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এখন রাজনৈতিক চাকরি। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ভয় পান কোনও টেকনিশিয়ান বা কোনও গ্রুপ ডি কর্মচারীকে যে-কোনও ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। সমস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা লুটের মাল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে হাসপাতাল ভাঙচুর হয়, ডাক্তার প্রহার হয়। গতকাল হাতুড়েকে মারা হয়েছে, আগামীকাল এমবিবিএস বা এমডি-কেও মারা হতে পারে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ নিয়েই বড় হচ্ছে।'

চতুর্থ পৃষ্ঠায় এই প্রতিবেদনটা ছাপা হয়েছে, পঞ্চম পৃষ্ঠায় তিন লাইনের ছোট্ট খবর—প্রহৃত হাতুড়ে ডাক্তারের মৃত্যু।

১১

ফিউচার বিল্ডার্স থেকে ফোন পেল ভজন।

কী স্যার কী ভাবছেন! টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করছেন তো?

—হবে না হবে না হবে না। টেলিফোন রিসিভারের সামনেই তিনবার মাথা নাড়ল ভজন।

—কেন হবে না?

—এত টাকা কিছুতেই হবে না। অসম্ভব। আমার কিডনি-লাং-লিভার বেচলেও হবে না।

—আরে স্যার ঘাবড়াবেন না। হবে, হবে। সব হবে। শুধু প্রতিজ্ঞাটা বুকে আগলে রাখুন যে, আপনার ছেলেকে আপনি ডাক্তারি পড়াবেন।

—না, পড়াব না।

—সে কী স্যার, আপনি নিজে ডাক্তার, আপনার ছেলেকে ডাক্তারিটা পড়াবেন না!

—কে বলল আমি ডাক্তার? আমি একজন কোয়াক। হাতুড়ে।

—তো? ডায়রিয়া হলে আপনি ওআরএস খাওয়ান না? একজন এমডি ওই ওআরএস-ই খাওয়াবে। জ্বর বেশি হলে আপনিও প্যারাসিটামল দেবেন এমডি-ও তাই দেবে। আপনি নিজেকে ছোট ভাবছেন কেন? আপনি ডাক্তার, আপনার ছেলেকেও ডাক্তার করবেন সেই প্রতিজ্ঞাটার প্রদীপ এলআইসি-র লোগোর মতো বাঁচিয়ে রাখুন।

—বাইরে বড় বদ হাওয়া। ওসব প্রদীপ-টদীপ থাকবে না। তাছাড়া এসব প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজেই পুড়ছি। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার দরকার নেই।

—তো ছেলের ভবিষ্যতের কথা কিছু ভাবছেন না?

—ও দেখা যাবে খ'নে। ওর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

—ভাগ্য তো স্যার আপনার নিজের হাতে। হাতে মানে হাতের রেখার মধ্যে নয়, কবজির মধ্যে, হাতের আঙুলে, কনুইয়ে, পাঞ্জায়। বুঝতে পারছেন তো আমি কী বলতে চাইছি?

—আমি এবার ফোনটা ছাড়তে চাইছি।

—ছেড়ে দিন। শুধু জিজ্ঞাসা করছি আপনি কি আপনার ছেলেকে নিজের চেম্বারে বসিয়ে ডাক্তার বানাতে চান? যদি মনে করেন, তাই করুন। বাইরে এখন আইটি ছাড়া চাকরি নেই। বরং যেভাবে হোক, যে ধরনেরই হোক ডাক্তার বানানোই ভালো। যে ডাক্তার হোক, যেভাবে হোক।

—শুনুন, একটা কথা বলি। আমার ছেলেকে আমি কোয়াক বানাব না, কিছুতেই না। বরং মুদি দোকান করবে, সেলসম্যান হবে, বরং প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারি করবে, কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তার হবে না।

রেগে গেছে ভজন। মুখ থেকে থুতু ছিটকে পড়ে।

ফোনের ও-প্রান্ত থেকে ভেসে আসা গলাটি বড় পেলব এখন। বলল,—শুনুন স্যার, আপনার ছেলেকে আপনি ডাক্তারই করাবেন। রীতিমতো সরকারি মেডিকেল কলেজে। বেশি টাকাও লাগবে না, এত কম যে ভাবতেও পারবেন না।

—কত কম?

—যা বলেছিলাম তার প্রায় হাফেই হয়ে যাবে। আপনি আমাদের অফিসে আসুন। ফোনে এসব কথা বলা যাবে না।

সব কেমন ঘোলাটে ঘোলাটে লাগে। এত দরদাম হয় নাকি এ লাইনে? গরুহাটাতেও এত দরাদরি হয় না। মাছের বাজারে কেজিতে দু-টাকাও দাম কমায় না। ডাক্তারি পড়ার বাজারে এত দরদাম চলে? এসব জানা ছিল না।

পরদিনই দুর্গা নাম করতে করতে ফিউচার বিল্ডার্স-এ ঢুকল।

সুন্দর দেখতে ছেলেটার হাসিটাও কী সুন্দর!

—আজ বেশ গরম, তাই না?

—হ্যাঁ।

—ঘামছেন দেখছি।

—হ্যাঁ।

—ঠান্ডা খাবেন?

—না। শুধু জল।

একটা ঠান্ডা জলের বোতল সামনে চলে এল।

ঘরে ওই ছেলেটা। আর কেউ নেই। দুটো কেবিন ফ্যান ঘুরছে।

ছেলেটা সামান্য কেশে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিল।

বলল, দেখুন ডক্টর মৃধা, পৃথিবীটা বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে বেঁচে থাকতে হলে শুধু পরিশ্রম নয়, বুদ্ধিরও দরকার হয়। নানা লোক নানাভাবে বুদ্ধি খাটাচ্ছে, মেধাও। বুদ্ধি বিক্রি করছে, মেধা বিক্রি

করছে। আপনার ছেলের জন্য আমরা মেধা কিনব। বুঝলেন, মাথা নাড়ে ভজন ডাক্তার। কিছুটা নার্ভাস। আর এক ঢোক জল খায়। বলে, না তো, কিছুই তো বুঝলাম না।

—বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনার ছেলের জন্য আমরা বুদ্ধিমান ছেলে ভাড়া করব। ট্যালেন্টেড। বলে বলে জয়েন্টে পাশ করে। আপনার ছেলের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে দিবে। ছেলেটাকে তিন লাখ দিতে হবে, আর আমাদের জন্য প্রসেসিং ফি তিন লাখ। মোট ছ-লাখ টাকা মাত্র খরচ আপনার। আরও পাঁচশো লাগবে, সেটা মিষ্টির খরচ। ভরতি হয়ে গেলে সবাই মিলে আমরা পেট ভরে নকুড়ের সন্দেশ খাব। নকুড়ের সন্দেশ খুব ভালো, তাই না?

গলা শুকিয়ে গেছে ভজনের। সন্দেশ ছাড়াই। বেশ খানিকটা জল খেয়ে নেয় ভজন। ভজন তোতলায়। বলে,—মানে আমার সুবোধকে জয়েন্ট পরীক্ষাতে বসতেই হবে না?

কোনও দরকার নেই। ওর কাজ করে দেবে অন্য এক ট্যালেন্টেড ছেলে। ওর কেরিয়ার খুব ভালো। গত চার বছরে পাঁচটা স্টেট-এ কুড়িটা জয়েন্টে বসেছে, উনিশটাতেই পাশ করেছে। ওর স্ট্রাইক রেটটা বুঝতে পেরেছেন স্যার!

—কী রেট?

—স্ট্রাইক রেড। বুঝতে পারবেন না। এজন্যই ওর রেটটা বেশি। তিন লাখের চেয়ে দশটা টাকা কমায় না। ওই ছেলেটা যদি পরীক্ষা দেয়, আপনার ছেলে শিওর পাস। তবে ওই ছেলেটাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে। জয়েন্টের রেজাল্ট বেরুলে আমাদের টাকাটা দিয়ে দেবেন।

—তার মানে তিন লাখ অ্যাডভান্স দিতে হবে আমাকে?

—আজ্ঞে।

—যদি না হয়।

—হবেই।

—যদি...

—ফেরত পেয়ে যাবেন।

—লিখে দেবেন?

—মুখের কথা। জবান।

—তারপর যদি শেষ পর্যন্ত...

—বললাম তো জবান।

—যে ছেলেটা পরীক্ষা দেবে ওর সঙ্গে একটু কথা বলা যায়?

—না।

—ওর সঙ্গে আপনাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ওকে আমরা দেখাবই না। ভজন বলে, আর একটু খোলসা করে দিন ভাই। পরীক্ষা যে দেবে তার ফোটো লাগে, অ্যাডমিট কার্ড লাগে। গেজেটেড অফিসার দিয়ে সই করাতে হয়, অথচ ছেলে আমার পরীক্ষাটাই দেবে না বলছেন, অন্য ছেলের মুখের সঙ্গে আমার সুবোধের মুখের মিল হবে কী করে?

ছেলেটা হাসে। দু-বার কলমটা ঠুকল টেবিলে। টেবিলে কাচ। ঠকঠক করে শব্দ হল।

বলল,—সব ভাবনা আমাদের। আমরাই ফর্ম তুলে নেব, আমরাই ছবি সাঁটব। ফর্মের তলায় সুবোধ কুমার মৃধা যে সইটা থাকবে, সেই সইটা আপনার ছেলের করতে হবে না, আমার ছেলেটাই করবে। ছবিটাও ওরই সাঁটব। একটু আউট অফ ফোকাস করে তুলব আর কী। ওসব ভাবনা আমাদের। এজন্যই তো প্রসেসিং ফি-টা নিচ্ছি। আমরা সব রেঁধে, বেড়ে, আসন পেতে দেব, আপনি শুধু খেতে বসবেন।

বুঝলেন?

তবুও বুঝল না ভজন।

এমন করে ঘাড় নাড়াতে লাগল, যেন মাথাটা কাঁপছে।

এরপরেও যদি না বুঝতে পারেন তো আমি কী করব বলুন। বাড়ি চলে যান। ঠান্ডা মাথায় মিসেসের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ভজন বলে, একটা কথা বলব?

—বলুন...

—ওই যে আপনাদের ছেলেটা, তো একটা রত্ন, তাই না? শত ছেলেকে ডাক্তার করেছে, শত বাবা-মাকে খুশি করেছে, ওর খুব পুণ্য। ও খুব পুণ্যবান। ওকে একটু দর্শন করা যায় না?

—আপনার পেটে এত বুদ্ধি আছে আগে বুঝিনি তো? ছেলেটার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করিয়ে দেব না, সেটা তো আগেই বলেছি।

ভজন বলে, তাহলে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অ্যাঁ? আপনার ছেলেটা পরীক্ষা দিল, তারপর আমার ছেলেটা পাশ করবে তো?

—মানে?

—মানে—আপনার ছেলে জয়েন্ট দিল, আমার ছেলে ডাক্তারিতে ঢুকল, তারপর আমার ছেলে ডাক্তারিটা পাশ করবে তো?

—হে-হে-হে-হে। তা কী করে বলি।

—ডাক্তারি পরীক্ষাগুলো দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় না?

—সরি। সেটা এখনও করে উঠতে পারিনি। তবে হয়ে যাবে। একবার ভরতি হয়ে গেলে সবাই পাস করে। আগে ডাক্তারিতে মুখ্যমন্ত্রীর কোটা বলে একটা বস্তু ছিল। ওখানে ওই কোটায় যা খুশি ভর্তি হত। ওরা তো ফেল করেনি কেউ।

মাথা চুলকোতে থাকে ভজন। তারপর দু-হাতে চুল টানতে থাকে।

টেনশন করছেন কেন ডক্টর মৃধা?

তার মানে ছ-লাখ?

পাস করার পর এক বছরে উশুল হয়ে যাবে।

১২

বি এসসি পড়ছে সুবোধ, পাস কোর্স। দোতলার ঘর। টেবিল চেয়ার, একটা ইজিচেয়ারও রাখা আছে, পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে ইজিচেয়ারে একটু আরাম করবে। এটা সুবোধের ঘর। ঘরে তারা মায়ের একটা ছবিও রাখা আছে, তারাপীঠ থেকে কেনা। ছবিতে প্লাস্টিকের জবা, কখনও শুকোবে না। একটা তারাস্তবাঞ্জলি কিনে আনা হয়েছিল—তারাপীঠ থেকেই, সুবোধের মা বলেছেন রোজ স্নান করে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে একটা করে স্তব পড়বি, আর মনের আশা জানাবি। সুবোধ সত্যিই সুবোধ। ও তাই করে। সুবোধ জানে ওর মা-বাবার মনোবাঞ্ছা। কিন্তু সুবোধ জানে—ওটা হবে না। জয়েন্ট পাস করার কোনও সিন নেই। আর একবার জয়েন্ট দেবার কথা ভাবছেই না। কিন্তু বাবা বলছে আবার পরীক্ষায় বসতে। বাবা কি ভাবছে কোনও ম্যাজিক হয়ে যাবে? তারা মা পাস করিয়ে দেবে? কুড়ি হাজার র‍্যাংকের ডান দিকের দুটো শূন্য ভ্যানিশ হয়ে দুশো হয়ে যাবে!

বাবা মাঝে মধ্যে চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, এগুচ্ছে? সুবোধ চোখ নামিয়ে মাথা কাত করে। কী এগোনোর কথা জানতে চায় বাবা! জয়েন্ট-এর প্রিপারেশন? তা কেন হবে, তা হলে বাবা নিশ্চয়ই মাস্টার রেখে দিত, কিংবা কোনও ভালো কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দিত। কত কী কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন দেখে কাগজে। আকাশ, স্কাইপার, ক্র্যাকার...। কত ছবি, যারা ওখান থেকে পাস করেছে...। ওগুলোর দিকে তাকায় না সুবোধ। খবর কাগজে, চোখ থেকে দু-ফুট দূরে থাকলেও ওরা সব বহু দূরের, ওরা স্টার। স্টারেরা কোটি কোটি মাইল দূরে থাকে। তা হলে হয়তো বাবা বি এসসি

কেমন এগোচ্ছে, সেটাই জানতে চায়। কিন্তু বলে না—ক্যালকুলাসের ওইসব ইকরিমিকরি বুঝতে পারছি না বাবা, কেমিস্ট্রির ফর্মূলাগুলো ভুলে যাই...। অঙ্কের জন্য একটা স্যার রাখা দরকার, নইলে অঙ্কে পাস করা মুশকিল।

অপর্ণা ইংলিশ মিডিয়াম। ও ফটফট ইংলিশ বলে। ফোনে যখন কথা বলে, ফুল ইংলিশ বের হয়, গোটা সেনটেন্স। ওর কোল্ড ড্রিংক চাই। ফ্রিজে থাকে। ওর জন্যই আনা হয়। আর কেউ খায় না, ও একাই খায়। খাক গে, ছোট বোন।

অপর্ণা ক্লাস নাইন। ও ডাক্তার হবে না বলে দিয়েছে। যেদিন মা ভুল করে একটা ভাঁড় ঢুকিয়ে দিয়েছিল ফ্রিজে, ভাড়টার ওপরে সাদা কাগজ, গার্ডার দিয়ে বাধা, একজন দিয়ে দিয়েছিল, রুগি বা অনেকে ভালো হলে মিষ্টি দিয়ে যায়, পরে দেখা গেল ভাঁড়ের মধ্যে অ্যা... ছি ছি। স্টুল পরীক্ষার জন্য দিয়ে গিয়েছিল...। তখনই বলেছিল আমি জীবনে ডাক্তারি লাইনে যাব না। মা বলেছিল—বাবার মতো ডাক্তার হবি কেন, পাস করা ডাক্তার হবি, পাস করা ডাক্তারদের কাছে কেউ এসব পাঠায় না। অপর্ণা বলেছিল—না বাবা, ডাক্তারের কাজ খুব ঝামেলার। ব্লাড, ইউরিন, একজিমা, খোশ পাঁচড়া, বমি ওয়াক। আমি টিচিং লাইনে থাকব। টিচিং শব্দটা এধার ওধার করে দিলেই তো চিটিং। বাবা কি ওরকম কিছু করতে চাইছে? ফোনে কী সব কথা হচ্ছে, আস্তে আস্তে, কখনও ফিসফিস। কেউ কাছে থাকলে বলছে পরে কথা বলব, কখনও হ্যান্ড সেটটা নিয়ে দূরে গিয়ে কথা বলছে। কী কথা বলে?

একদিন বাবা বলেছিল তোর ম্যাপের বইটা খোল তো সুবোধ, ইউক্রেন কোথায় দেখি...।

ইউক্রেন নামটা শোনা, কিন্তু ঠিক কোথায় মনে পড়ছিল না। ম্যাপ বইটা তাক থেকে খুঁজে বের করল সুবোধ। এশিয়ার ম্যাপেই ইউক্রেন পেয়ে গেল সুবোধ। কাস্পিয়ান সাগরের ধারে। আঙুল ছোঁয়াল ওখানে।

কতদূর হবে?

সুবোধ বলল সাত-আট হাজার কিলোমিটার হতে পারে। এখান থেকে দিল্লি যা, তার চার গুণ ধরে নাও। সুবোধ বুঝতে পারছে ওখানে ডাক্তারি পড়াবার কথা ভাবছে বাবা।

—ওখানে কী ভাষায় লোকে কথা কয়? ভজন জিজ্ঞাসা করল।

সুবোধ কি জানে এত? জানি না বলে না। বলে—ওদের নিজেদের ভাষা নিশ্চয়ই আছে, তবে পড়াশুনোটা বোধ হয় ইংলিশ মিডিয়ামেই হয়।

ওখানে ডাক্তারিতে চান্স পেলে পড়তে যাবি?

সুবোধ মাথা নীচু করে। বলে তুমি যদি বলো, যাব।

আসলে সুবোধ জানে ওর বাবার ভিতরকার ইচ্ছেটা। নিজের ভিতরেও কি ইচ্ছে-পাখি ডানা ঝাপ্টায়নি? সেই ছোটবেলায় একটা 'আবোল তাবোল' পেয়েছিল। সুকুমার রায়ের। মা জন্মদিন করেছিল, অনিলদা দিয়েছিল বইটা। অনিলদা ছিল ওর প্রাইভেট মাস্টার।

'আবোল তাবোল' বইতে একটা কবিতা আছে। কবিতাটা পড়ার সময় বিচ্ছিরি লেগেছিল। কবিতার নাম 'হাতুড়ে'। 'শুয়ে কেরে? ঠ্যাং ভাঙ্গা ধরে আন এখেনে, স্ক্রুপ দিয়ে এঁটে দেব কি রকম দেখেনে। কালাজ্বর পালাজ্বর পুরোনো কি টাটকা, হাতুড়ির এক ঘায়ে একেবারে আটকা।'

ছবিটাও কী বিচ্ছিরি। টেবিলের ওপরে রাখা কাঁচি, হাতুড়ি। হাতুড়ে ডাক্তার কেন বলে? হাতুড়ির সঙ্গে কী সম্পর্ক? হাতড়ে হাতড়ে চিকিৎসা করে বলে! ইস্কুলে একটা ছেলে প্রাইজের ফাংশানে 'হাতুড়ে' আবৃত্তি করেছিল নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে।

পাশের ছেলেরা সুবোধের দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। সুবোধের মনে হচ্ছিল ওরা মুচকি মুচকি হাসছিল। ওগুলো কি ব্যঙ্গ? তাচ্ছিল্যের হাসি? বাবা কি রোগী ভালো করেনি? সুবোধ জানে, অনেক কঠিন কঠিন রোগী ভালো করে দিয়েছে বাবা। বাবার দুঃখ—কোনও সার্টিফিকেট দিতে পারে না, বাবার রেজিস্ট্রেশন নেই।

সুবোধ বলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা সার্টিফিকেট দিতে পারে, তাই না? ওদের তো রেজিস্ট্রেশন নম্বর হয়, তাই না?

ভজন বলে হোমিওপ্যাথদের না, বুঝলি বাজারে ইয়ে নেই। হোক পাস করা, বিএইচএমএস, লোকে বলে পুরিয়া ডাক্তার। সে অবশ্য আমাদেরও হাতুড়ে বলে লোকে। কিন্তু অ্যালোপ্যাথদের মানুষ একটু গণ্যমান্য করে। বিদেশ থেকে পড়ে এলে তো আরও বেশি। কিন্তু অনেক টাকা রে সুবোধ। ইন্ডিয়ার চেয়ে ইউক্রেন টিউক্রেনে কিছু সস্তা পড়ে বটে, তবে এতদিন তোকে ছাড়া থাকতে পারবে তোর মা? বুঝলি সুবোধ, হোমিওপ্যাথিটাও খারাপ নয়। প্র্যাকটিস ভালোই হয়। গলায় স্টেথোস্কোপটা তো ডাঁটসে ঝোলানো যায়। আমি বহুদিন ওটা গলায় ঝোলাতে পারিনি রে, লজ্জা করত। হাতে গুটিয়ে রাখতাম। পড়বি, হোমিওপ্যাথি পড়বি?

—তুমি যা বলবে বাবা।

ভজন চুপ করে যায়।

ফিউচার বিল্ডার্স-এর লোকটার মুখ ভেসে এল।

ও একটা ছেলে ভাড়া করে দেবে বলেছিল, যে সুবোধের হয়ে অ্যাডমিশন টেস্ট দেবে।

কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না ভজন। নেপাল না চিন না ইউক্রেন না জাল পরীক্ষা না হোমিওপ্যাথি?

১৩

ভিটেটা বেচে দিচ্ছে ভজন মৃধা। শুঁটিয়ার সেই ভিটেটা। যেখানে জন্মেছিল। সেই কাঁঠাল গাছ, পেয়ারা গাছ—কলতলা, কলাঝাড় সব। আগামীকাল বায়না হবে। বেশি তো নয়, দশ কাঠা।

এখন অনেকদিন এ বাড়িতে থাকে না। বারাসাতে ফ্ল্যাটে থাকে। কিন্তু মাঝেমধ্যে আসত। গাছের ছায়ায় বসে একটা সিগ্রেট খেত। জংলি লতাটার দিকে, ঘোড়াকলমির নীল ফুলে বসা ফড়িংটার দিকে, সযত্নে বেড়ে ওঠা আকন্দ ঝোপের দিকে তাকিয়ে থাকত। বাড়িটা তালা দেওয়া। তালা খুলে একটা ঘরে ঢুকে পায়রার বকম বকম শুনত, এ চত্বরের বাসিন্দা কাঠবিড়ালির সঙ্গে মনে মনে কথা বলত।

কাল বায়না হবে। আজ চেম্বার যাওয়ার পথে এখানে এল। ঘরের পিছনদিকে গেল। আপনমনে একটা কুমড়ো লতা তার শরীরে কমলা রং-এর ফুল সাজিয়েছে। তার পাশে গুচ্ছের শুশনি ল' ল' করছে। উঠোন। সেই উঠোন। মায়ের উঠোন। চারদিকে তাকিয়ে গোপনে একটা প্রণাম ঠুকে নিল। তারপর বারবার মাথা কুটতে লাগল।

মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে ভজনের। ছেলেটাকে কিছুই বলেনি এখনও। সুবোধ বড় সুবোধ ছেলে। বড় ভালো। ওকে এখনও বলতে পারেনি। কী ভাবে বলবে? বেশ কিছুদিন ধরে একদম ঘুমোতে পারছে না ভজন। ঘুম হচ্ছে না একদম। ঘুম আসে না। মাথার ভিতরে কী যেন দপদপায়। কে যেন ঘোরে। ঘুমের ওষুধ খায়। তবু ঘুম নেই।

পরেরদিন চেম্বার গেল না ভজন। বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথা বলল না। সারাদিন চুপচাপ। দুপুরবেলাটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ছাদ থেকে ঝুলছে বাবুইপাখির বাসা। বাবুইপাখির বাসা কেন ছাদ থেকে ঝুলবে? ওটা একটা ঝোলা, একটা ব্যাগ, যেখানে আশা আকাঙ্ক্ষা রাখা আছে। না, ওটা ঝুল। ঝুলঝাড়নি দিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি কতদিন।

রেবতী বলল, শুয়ে আছ কেন? শরীর খারাপ?

ভজন রেবতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। রেবতীর মুখটাও যেন পুরোনো ভিটে। ভজনের কপালে হাত দেয় রেবতী। গায়ে হাত দেয়।

না, গা তো গরম নয়। মাথা টিপে দেব?

ভজন বলে—না, ওসব করতে হবে না। একটু বিশ্রাম করছি। আর কিছু নয়। ভজন বুঝতে পারছে না, কাকে কী করে বলবে। সুবোধকে এখন কি কিছু জানাবে, নাকি হয়ে গেলে জানাবে? সারপ্রাইজ! সুবোধ খুশি হবে তো? সুবোধ ভয় পাবে না তো?

সুবোধ, সোনা আমার, আমি কি তোকে নষ্ট করছি? নিজে নিজে বলে ওঠে ভজন, নিজেও শুনতে পায় না।

ওরা ফোন করে ছিল আমায়। আপনি রেডি তো স্যার?

রেডি হচ্ছি।

রাইটারকে বলে দি?

রাইটার মানে?

সেই ছেলেটা, যে আপনার ছেলের হয়ে....।

ও, হ্যাঁ। ধরা পড়লে?

ধরা পড়লে আমরা পড়ব। আপনার তো কোনও ভয় নেই। কোনও রিস্ক নেই আপনার। আপনার কোনও রেজিস্ট্রেশন নম্বরও নেই যে ক্যানসেল করে দেবে। আর আপনার ছেলেরও ক্ষতি নেই কোনও, এখন যা করছে, তাই করবে। কেস খেলে আমরা খাব, তবে আজ অব্দি কিছু হয়নি।

তা ছাড়া সব সেটিং করা আছে।

ও।

চার-পাঁচ বছর পর আমাদের কাছে আসবেন, রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে, যখন আপনার ছেলে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে আপনার কাছে যাবে, উইথ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার।

ও।

ছেলেটাকে তো অ্যাডভান্স করতে হবে।

ও।

কী ও-ও করছেন? আমাদের তো তিন লাখ অ্যাডভান্স করতে হবে।

ও।

কবে আসবেন?

কবে?

হ্যাঁ, কবে আসবেন বলুন, ছেলেটাকে যদি অন্য কেউ নিয়ে নেয়, তাহলে আমরা পাব না। কবে আসছেন?

দুদিন—না না, তিন দিন। আজ কী বার?

মানডে। সোমবার।

বৃহস্পতিবার চলে যাব।

ওকে। উইদাউট ফেল।

কাল বায়না হবে। ওরা কিছু আগাম দেবে। আর জমানো যা আছে, তা নিয়ে লাখ তিনেক হয়ে যাবে। মাস দুয়েক পরে জমি বিক্রি। চান্স পেলে বাকি টাকাটা দিতে হবে।

শুঁটিয়ার বাড়ির জামগাছে একটা দোলনা ছিল। ঠাকুরদাদার পায়ের ছাপ ছিল ঘোষেদের বাঁধানো পুকুরের সিমেন্টে। পুকুরে দুটো বড় কাতলা ছিল জগাই আর মাধাই।

জমিটা বেচতে তো হতই। আজ না কাল। কী হবে রেখে। জমিটা বেচলে মেয়ের বিয়ের জন্যও কিছু টাকা রেখে দেওয়া যাবে।

চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে ভজন। সন্ধে হয়। জানলার ফাঁকে আকাশ। কি একটা গান আছে, শোনা যায় মাঝে মাঝে। রবীন্দ্রসঙ্গীত-ই হবে। আমি কেবল-ই স্বপন করেছি বপন আকাশে। আকাশে চাঁদ। চাঁদের

যেন জন্ডিস। লাইটপোস্টে আলো বমি করছে। রাস্তার অটোরিকশার হর্নে শূলবেদনার রোগীর চিৎকার।

চা নিয়ে আসে রেবতী।

বেরুলে না একটু?

টিভিটা চালায়। এসময় একটু টিভি দেখে রেবতী।

কী করে তোকে বলব বলতে যা চাই...একটা গান। সিনেমার।

ভজন ঘুরে আসে বাইরে থেকে। কাল বায়না। লিখে দেবে ভিটের অঙ্গীকার। রাত্রে শুয়েছে ভজন। ঘুম আসে না। পিতা, পিতামহ আসে। বলে বসতে দিবি তো, নাকি তাড়াবি? ঘোষেদের পুকুরের জগাই মাধাই বিছানায় লুটোপুটি খায়। একটা দড়িওয়ালা লোক আসে, চেনা, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না, বলে ছেলেটাকে নিজে হাতে নষ্ট করছিস? ও কি যাত্রার বিবেক? ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুমের ওষুধ খেয়েই তো ঘুমিয়েছিল ভজন। গত ছ'মাস রোজই খায়। গত সাতদিন ধরে ডবল ডোজে খাচ্ছে, তবু ঘুম আসছে না। বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বালায়। আরও দুটো খেয়ে নেয়। রেবতী মেয়ের সঙ্গে শোয়।

ঘুম আসছে। কালো। কালো গাড়ি। কালো গাড়ির ভিতরে কালো ছায়া। কালো ছায়ার ভিতরে কালো পোশাক-পরা ভজন আর সুবোধ। সাদা পোশাক পরা ওরা কে? মাথা টলমল করে। উঠে জল খায়। এভাবে বাঁচার কোনও মানে হয় না। কতদিন এই অশান্তি? সারা জীবন? ছেলের হাতে একটা জাল ডিগ্রি তুলে দিচ্ছে বাবা হয়ে?

জাল ডিগ্রি কেন হবে? ডিগ্রিটা তো জাল নয়, কিন্তু পরীক্ষাটা তো জাল। সারা জীবন বয়ে বেড়াবে এই পাপ? দুজনেই?

ছেলে সামনে এসে দাঁড়ায়। সুবোধ।

সুবোধের এই রূপ কখনও দেখেনি। আঙুল উঁচিয়ে রেখেছে। হাতের তর্জনী যেন পিস্তলের নল।

আমাকে তুমি নষ্ট করলে বাবা?

ভজন মিন মিন করে, সুযোগ বারবার আসে না, তাই ভাবলাম...

আমি কিন্তু তোমাকে সারা জীবন...

ধুর, এ জীবন রাখবই না।

ষ্ট্রিপ খুলে আরও কয়েকটা বড়ি হাতের তালুতে তুলে নেয় ভজন, তার পর একসঙ্গে মুখে দিয়ে জল খেয়ে নেয়। টাটা বাই বাই। সুখে থেকো।

জমিটা রইল। চেম্বারও রইল। দরকার হলে চেম্বারে মুদি দোকান করিস সুবোধ। যা করতে চেয়েছিলাম তোর ভালোর জন্যই। বারবার এসে বাগড়া দিচ্ছিস। যা খুশি করগে যা। আমি চল্লাম।

সকাল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। খবর কাগজ দিয়ে গেছে। ভজন এখনও ঘুমোচ্ছে।

রেবতী ধাক্কা দিল। কেঁপে উঠল ভজনের দেহ। রেবতীর মনে হল সুবোধের বাবার ঠোঁট কালো। ঠোঁটের কোনায় ফেনা। রেবতী চিৎকার করে ওঠে। সুবোধ আর অপর্ণা কাছে আসে।

বাবা, ও বাবা, ওঠো।

ভজন ওঠে না।

সুবোধ চিৎকার করে ওঠে। বাবা গো....।

সুবোধ দেখে ঘুমের ওষুধের খালি রুপোলি রাংতা। এবার আরও জোরে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বাবার শরীরে। অপর্ণা বলে, শিগগিরি ডাক্তার ডাক দাদা, নিঃশ্বাস পড়ছে ।

ভজন সমুদ্রের শব্দ শোনে। ঢেউ। দেখে সাঁতরে সাঁতরে ক্রমশ পাড়ের দিকে আসছে। সাইরেন শব্দের মতো একটা আওয়াজ। পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সুবোধ। সুবোধ সেই ছোট্টবেলার মতো। নেংটু। বাবা

ফিরছে বলে আনন্দে লাফাচ্ছে, সাঁতরাচ্ছে ভজন। পাড়ে এসে দাঁড়িয়েই সুবোধকে কোলে তুলে নেয়। বলে তোকে আমি নষ্ট করব না সোনা।

ডাক্তার বড়ুয়া জিজ্ঞাসা করলেন ক'টা বড়ি খেয়েছিলেন ভজনবাবু? ভজন বলল—গুনিনি। কিন্তু আজ আমায় একবার ডাক্তার মৃধা বলা যেত না ডাক্তার?

হোমিওপ্যাথ

পিতৃপরিচয়

রুমা আর কমলের মাঝখানে এখন জ্যোৎস্না শুয়ে আছে। কমল এই গভীররাতে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকে। কমল নিঃশব্দে দু'বার ডাকে জোছনা, জোছনা। জোছনা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? কমল জোছনা স্পর্শ করে রুমা বুঝতে পারছে না। জোছনা কমলকে জড়িয়ে ধরে। কমল জোছনার দিকে সরে যায়। তখন কমলের সারা শরীরে জোছনা। কমল জোছনার সঙ্গে মাখামাখি করে। জোছনা তো রোজ আসে না। জোছনা করেছে আড়ি, আসে না আমার বাড়ি...।

আগে প্রায়ই আসত। পুবদিকটা তখন খোলা ছিল, দক্ষিণও। চাঁদ প্রায়ই জানলা গলে ঘরে ঢুকত। গত দু'বছর হল পুবদিকটায় নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে। সম্পূর্ণ বন্ধ। দক্ষিণেও বাড়ি উঠেছে। লম্বা-লম্বা পিলার বসে গেছে। ছ'তলা পর্যন্ত ঢালাইও হয়ে গেছে। ইটের কাজটা এখনও শুরু হয়নি। দেওয়াল হয়ে গেলে দক্ষিণ দিকটাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এখনও তাই কংক্রিটের ফাঁকফোকর দিয়ে চাঁদ দেখা যায়। জোছনার ফালি এসে পড়ে। কমল আর রুমার মাঝখানে এখন একফালি জোছনা। একফালি যেন এক মাঠ। কমল আর রুমার মাখখানে দেড়-দু'ফুট জায়গা যেন একটা মাঠ। ওরা দুজনে যেন দুটো আলাদা পাড়ায় শুয়ে থাকে।

কমলের আজ ঘুম আসছে না। আজ ঘুমের ওষুধ খায়নি। ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছিল। কমল নিজে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কিন্তু ঘুমের জন্য অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খায়। হোমিওপ্যাথিতে কাজ হয়নি। প্যাসিফ্লোরা, ককুলাস, ল্যাকেসিস, এমনকী ওপিয়ামও ট্রাই করেছে। ওপিয়ামের লক্ষণ হচ্ছে বিছানা গরম বোধ হওয়া। ল্যাকেসিসের লক্ষণ হচ্ছে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাওয়া। কিন্তু বিছানায় শুলেই কমলের মনে হয় কোনও গুহার ভিতরে শুয়ে আছে, দরজা-টরজা কিছু নেই। রাত্রে কোনও মাংসভোজী জানোয়ার গুহার ভিতরে ঢুকে ওকে ছিঁড়ে খাবে। জানোয়ারের ভয়ে স্ট্রামোনিয়াম কাজ করে। সামান্য কারণেই ক্রন্দন, আবেগের আধিক্য পালসেটিলার লক্ষণ। উদ্ভট কল্পনা, বিষণ্ণতাতে পডোফাইলাম। এই যে চাঁদের ফালিটা, মানে জোছনাটা এই বিছানায় শিশুর মতো হাত-পা ছুড়ছে এটা কি উদ্ভট কল্পনা! নাকি আবেগের আধিক্য? পডোফাইলাম, নাকি পালসেটিলা?

কমল জোছনার হাত-পা ছোড়া জোছনা-শিশুর দিকে তাকিয়েই থাকে। রুমা পাশ ফেরে। হাতটা প্রসারিত করে। ও রুমা, জোছনাকে ঘুম পাড়াবে বুঝি? দুধ খাওয়াবে? বুকের দুধ? জোছনা বড় কাঁদছে।

২

কমল ভোরবেলাতেই ওঠে। ভোরে উঠে গঙ্গার ধারে হাঁটতে যায়। রতনবাবুর ঘাটের ওপর বসে অনেককে প্রাণায়াম করতে দেখে সে। ভস্ত্রিকা, অনুলোম-বিলোম, কপালভাতি...। কিন্তু অনেকদিনই ভোরবেলায় মাংসপোড়ার গন্ধ পায় কমল। ইলেকট্রিক চুল্লিতে মানুষ পুড়ছে। ওদিকে জবাকুসুমশঙ্কাশং কাশ্যপেয়ম মহাদ্যুতিম, আর এদিকে মানুষের মাংস পুড়ছে। তারই মধ্যে অনুলোম-বিলোম কপালভাতি। মানুষ বড় বিচিত্র। পৃথিবীটাও।

কমল একদম মাংসপোড়া গন্ধ সহ্য করতে পারে না। ও রতনবাবুর ঘাট ছাড়িয়ে কাশীপুরের দিকে চলে যায়। শ্মশানের গন্ধ এতটা দূরে আসে না। এদিকে গঙ্গার ধারে এখন অসংখ্য ঝুপড়ি। ওখানে অনেক বাংলাদেশি। বিহার থেকে আসা কিছু মানুষজনও আছে। ওরা সব মূলত কাগজ কুড়োয়। ওদের ঝুপড়িগুলোর পাশে নোংরা কাগজ আর প্লাস্টিকের বান্ডিল। কিছুটা বস্তাবন্দি। বাতাসে একটা দুর্গন্ধ মিশে থাকে। কোথাও শান্তি নেই। কোথাও ঠিকঠাক জায়গা নেই। ওদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না। সকাল থেকেই অটোর উৎপাত। প্রাইভেট টিউশন নিতে যায় যারা, ওরা সব সাইকেলে পোঁ পোঁ করে ছোটে। ওদের সময়ের বড় দাম। ওদের কাছে সময় বড় বিষম বস্তু। দু'-একজন আবার

স্কুটারেও যায়। একদিন স্কুটারের ধাক্কা খেয়েছিল কমল। কোথায় হাঁটবে? তাই গঙ্গার ধার। গঙ্গার মতো এত সুন্দর নদীটা কী অবহেলায় অনাদরে থাকে। কলকাতা শহর নদীটার মর্ম বুঝল না। গঙ্গার ধারে হাঁটে কমল। এঁটো পলিথিন ছেঁচড়ায়, নোংরা কাগজ ওড়ে। ওরই ভিতরে মাদুর পেতে নামাজে বসে কেউ। ফজরের নামাজ। গঙ্গা থেকে ওজু করে আসে ওরা। ওজু মানে ভালো করে হাত-পা ধোয়া।

কমল দেখে গঙ্গা শুধু হিন্দুর নয়। সকালবেলা কোনও করিম কিংবা সিরাজ বা কোনও আলাউদ্দিন গঙ্গাস্নান সেরে নামাজে যায়। কোনও কোনও ঝুপড়ির ভিতর থেকে ঘণ্টার শব্দও ভেসে আসে। কমল হাঁটে। গঙ্গার ধারে ধারে, কোনও কোনও গাছের গোড়ায় কিছু কালো পাথর রাখা আছে। শিব। সকালে ভ্রমণকারীদের কেউ কেউ শিবের মাথায় জল দেয়, ফুল বেলপাতা দেয়। কমল ওসব করে না। তাই বলে কমল নাস্তিক নয়, আবার খুব একটা ভক্তিটক্তিও নেই। কমল গীতা-উপনিষদ পড়েনি, বাইবেল, কোরানও নয়। মন্দির দেখলে ছোট করে একটা প্রণাম ঠুকে দেয়। মন্দিরে কে আছেন, কালী না হনুমান জানার দরকার নেই, মন্দির মানে মন্দির।

একবার জ্যোতিষী দেখিয়েছিল সন্তান হবে কি হবে না জানতে। সে প্রায় বারোবছর আগে। জ্যোতিষী বলেছিলেন হবে। একটা পোখরাজ আর একটা গোমেদ পরতে বলেছিল। সেই আংটি এখনও হাতের আঙুলে। কয়েক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমানো আছে। খুব একটা দান-ধ্যানও নেই, শেয়ারে টাকা খাটায় না, অর্থের খুব একটা লোভও নেই। গরিব-টরিবরা অনুরোধ করলে কম পয়সায় ওষুধ দিয়ে দেয়। নিজের ফ্ল্যাট; বছরে একবার বেড়াতে যায়। খুব দূরে কোথাও যায় না, পুরী কিংবা দীঘা কিংবা রাজগীর। সিগারেট বিড়ি খায় না। মদও নয়। জীবনে পাঁচ-ছ'বারের বেশি মদ খায়নি। ভালো লাগে না। গল্প-উপন্যাস পড়ার অভ্যেস নেই। দু-একটা বাংলা সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা মাঝে মাঝে কিনতে হয় মূলত চেম্বারের রুগিদের জন্য। তখন ওসব একটু উলটে-পালটে দেখে। 'মেয়েরা কি ক্রমশ সস্তা হয়ে যাচ্ছে?' কিংবা 'বিয়ে না লিভ টুগেদার' জাতীয় ফিচার-টিচার পড়ে। রাত দশটার পর ঘণ্টাখানেক টিভি দেখার অভ্যেস আছে। একটু সুগারও আছে রক্তে। ব্লাডপ্রেশার ওপরের দিকেই। চুল পড়ে যাচ্ছে। একদম গড়পড়তা লোক। কোনও উপন্যাসের নায়ক হবার কোনও যোগ্যতা নেই।

৩

প্রেম-ভালোবাসা করে বিয়ে করা কেবলমাত্র উপন্যাসের নায়কদেরই একচেটিয়া অধিকার নয়, অমল বিমল কমলরাও করে। কমলের বিয়েটা ওরকমই। রুমার অম্বল সারিয়েই রুমার মন পেয়েছিল কমল।

কমল তখন আলমবাজারে একটা চিলতে ঘর পেয়েছে। ওখানে চেম্বার। দেওয়ালে একটা মানবদেহের ক্যালেন্ডার আর একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। কোনওদিন দুজন, কোনওদিন তিনজন করে পেশেন্ট হচ্ছে। এমন দুঃসময়ের দিনেই রুমা আসে ওর মায়ের সঙ্গে। বলল টক জল ওঠে, খিদে নেই। কমল দেখেছিল ওর গায়ের রংটা ফ্যাকাশে। চোখের তলাটা টেনে বুঝেছিল রক্তহীনতার লক্ষণ। টেবিলে রাখা কাঠের ওষুধের বাক্সের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করেছিল পিরিওড কি নিয়মিত হয়?....রুমা নয়, ওর মা উত্তর দিয়েছিল—বেশি হয়। পাঁচ-ছ'দিন ধরে...। কথা বাড়ায়নি। কমল বলেছিল ওটা পরে হবে। আগে অম্বলটা কমাই।

কার্বোভেজ দিয়ে শুরু করেছিল কমল। এক সপ্তাহের ওষুধ। রুমা একা এসেছিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হল লক্ষণভিত্তিক। খিটখিটে স্বভাবের মানুষের যদি মার্কসলে কাজ হয়, তো হাসিখুশি স্বভাবের মানুষের ওই ওষুধে কাজ হবে না। জ্বর-মাথাধরা-সর্দিজ্বরে মোটা লোককে একরকম ওষুধ, রোগা লোকের অন্য। অ্যালোপ্যাথির মতো নয়। মাথা ধরল তো সারিডন খাইয়ে দাও। হোমিওপ্যাথিতে দেখা হবে রুগির অনেক কিছু। দিনে বাড়ে না রাতে বাড়ে, আলোয় ভালো থাকে না অন্ধকারে ভালো থাকে, কম ঘামে না বেশি ঘামে, কম কথা বলে নাকি বেশি কথা বলে, ইন্ট্রোভার্ট না এক্সট্রোভার্ট সবকিছু দেখতে হয়। ফলে রুগির সঙ্গে অনেক কথা বলতে হয়।

দ্বিতীয় দিনে রুমার সঙ্গে কমলের এরকমই কথা হয়েছিল।

কমল : কেমন আছেন?

রুমা : একটু ভালো।

কমল : টক ঢেকুর?

রুমা : কম।

কমল : দিনে ক'বার?

রুমা : দু-তিন বার।

কমল : জল বেশি খাচ্ছেন তো?

রুমা : হ্যাঁ।

কমল : আর কী অসুবিধে?

রুমা : কিছু ভালো লাগে না।

কমল : দেখি পালস দেখি...

কিছু ভালো না-লাগাটা পালস-এ কিছু বোঝা যাবে না। জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা, কিছু ভালো না-লাগা, নিরাশা ইত্যাদি সোরিনামের লক্ষণ। গায়ের চামড়ায় এর প্রকাশ। চামড়াটা খসখসে হয়ে পড়ে। সেটা পরে হবে। কমল রুমার নাড়ি পরীক্ষা করতে লাগল। নাড়ি পরীক্ষাটা ভালো করে শিখলে পরে অনেক কিছু বোঝা যায়। আগেকার দিনে প্যাথলজিকাল পরীক্ষার বালাই ছিল না। এক্সরে ছিল না, এমনকী প্রেশার মাপার যন্ত্রও ছিল না। আগেকার দিনের চিকিৎসকরা শুধু নাড়ি টিপে বুঝে যেতেন বুকে কফ আছে কিনা, পিত্তর দোষ আছে কিনা। কমল রুমার রোগা হাতটা টেনে কবজিতে আঙুল রেখে চোখ বুজে ছিল। মনে হল নাড়ি দুর্বল। কিন্তু স্পন্দন বেশি। প্রথম দশ সেকেন্ডে যে স্পন্দন ছিল, তার পরের দশ সেকেন্ডে যেন বেড়ে গেল। পরের দশ সেকেন্ডে মনে হল নব্বই ছাড়িয়ে যাবে। চোখ খুলল কমল, দেখল মেয়েটা কমলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হয়। রুমা চোখ নামায়। কমল ওর ডান হাতের ওপর রুমার বাঁ হাত রাখে। হাতের তালুটি বেশ নরম। কিন্তু শীতল। তালুর ওপর হাত বোলায়। খসখসে মনে হচ্ছে। হাতের ওপরও হাত বোলায়। কমলের ভালো লাগে। কমল ভাবে, এভাবে ভালো লাগতে নেই। কমল নিজের ডাক্তারি সত্তাকে জাগ্রত করে। ক্লিনিক্যাল টেস্ট হচ্ছে এটা, স্রেফ ক্লিনিক্যাল টেস্ট।

চামড়ার খসখসে ভাব থাকলে সোরিনাম, পেলব হলে ডেইজি। ডেইজি একটা ফুল, এই ফুল দেখেনি কমল। হোমিওপ্যাথির মেটেরিয়া মেডিকাতে আছে। হ্যানিম্যান সাহেব একজায়গায় বলেছেন, মেয়েরা হল ডেইজি ফুলের মতন। ডেইজি গাছকে যত কাটুন, ভাঙুন, মচকে দিন, আবার নতুন করে ডালপালা মেলবে। ফুল ফুটবে। কমলের চোখের সামনে একটা ডেইজি ফুল। রুমার নাকের পাটাটা যেন একটু ফুলে উঠেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর। কমল চোখের তলাটা টানে। চোখের লালিমা দেখতে চায়, যেটা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ জানায়। ফ্যাকাশে।

—দুধ খেতে বলেছিলাম। খাচ্ছেন না?

মাথা নাড়ায় রুমা।

—কেন? দুধ না খেলে হিমোগ্লোবিন বাড়বে কী করে?

—আপনি তো ডুমুর খেতেও বলেছিলেন। ডুমুর খাই। ডুমুর সেদ্ধ...

—সেদ্ধ? বাজে লাগে না?

—লাগে, কিন্তু ওষুধ তো।

—কিন্তু দুধ...

—অনেক দাম। আমরা গরিব।

—বাবা কী করেন?

—নেই।

—মা?

—অভিনেত্রী।

একটু থেমে রুমা বলেছিল—ছিলেন। অভিনেত্রী ছিলেন। অফিস-ক্লাবে অভিনয় করতেন। অভিনেত্রী ভাড়া করত অফিস ক্লাবগুলো। এখন অফিস ক্লাবে নাটক-টাটক হয় না। যদিও হয়, বাইরের অভিনেত্রী ভাড়া করতে হয় না। অঢেল মহিলা। মা এখন একটা বাড়িতে রান্না-বান্না করেন।

—মা আর আপনি ছাড়া আর কেউ নেই?

—না

—আপনি? কিছু করেন?

—টিউশনি।

কমল বলেছিল চিন্তা-দুশ্চিন্তা করবেন না বেশি। একদম দুশ্চিন্তা করবেন না। চিন্তায় অ্যাসিডিটি বাড়ে। বই খুলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রুগির ক্ষেত্রে কী ওষুধ দেখতে লাগল কমল। বইয়ের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল—শীত ভালো লাগে, না গ্রীষ্ম?

—শীত।

—নোনতা না মিষ্টি?

—মিষ্টি!

বইতে যদিও নেই, তবু জিজ্ঞাসা করে ফেলল পাহাড় না সমুদ্র?

রুমা বলল কোথাও যাইনি।

কমল বলল, ও।

কমল ওষুধ পালটে দিয়েছিল।

৪

কমলই কি খুব বেশি পাহাড় সমুদ্র দেখেছিল তখন? পাহাড় বলতে বেলগাছিয়ার পরেশনাথের মন্দিরের ভিতরের ওই কৃত্রিম পাহাড়টাকেই বুঝত কমল। তারপর পাহাড় দেখেছে বেলগাছিয়ায় কিংবা গড়ের

মাঠে যখন মেট্রোরেলের মাটি ডাঁই করে রাখা হয়েছিল। পাহাড় তো দেখেছে ক্যালেন্ডারে, সিনেমায়। একবারই পাহাড় দেখেছে ভুবনেশ্বরে। উদয়গিরি খণ্ডগিরি। আর সমুদ্রও একবারই। মা-দিদি-দাদা-বউদি সবাই মিলে পুরী গেল যেবার। সমুদ্রও তখনই। আর একবার দীঘাও গিয়েছিল পাড়ার 'চলুন ঘুরে আসি' স্কিমে। সবাই খুব জোরাজোরি করল বলে যেতে হয়েছিল। ব্যস।

কমলের ঠাকুরদা ছিলেন কোনও এক বড়লোকের নায়েব। বরানগরের গঙ্গার পাড় ঘেঁষে কোনও বাগানবাড়ি ছিল। ওই বাগানবাড়ি দেখাশোনা করতেন। ওই বাগানবাড়িটা ছিল কয়েক বিঘে জুড়ে। মাঝখানে ছিল একটা পুকুর। ওই বাগানেরই একধারে কমলের ঠাকুরদা একটা বাড়ি পেয়েছিলেন। ওই অঞ্চলটার নাম মিত্তিরবাগান। কলকাতার মিত্তিরদের বাগানবাড়ি ছিল কিনা।

কমল যখন বালক, ও দেখেছে পুরোনো কয়েকটা আমগাছ রয়েছে। কয়েকটা কাঁঠালগাছ। পুকুরে ধোপারা কাপড় কাচছে, ওদের বাড়িটার ভিতরে অনেকরকম দেওয়াল, অনেকগুলো দরজা। কাকা-জ্যাঠাদের মধ্যে ঝগড়া। বাগানের খানিকটা দখল করেছে বাঙালরা। বাকিটা মালিকরা বেচে দিয়েছে। মিত্তিরদের মধ্যেও ঝগড়া। কমলের মনে পড়ে, গলায় সোনার হার-পরা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি-পরা একটা ফর্সা লোক গাড়ি থেকে নামামাত্র অন্য দুটো লোক কোত্থেকে এসে মাথায় লাঠির বাড়ি মারল লোকটাকে। সাদা পাঞ্জাবি মুহূর্তে লাল। পরে জেনেছিল মিত্তিরদের শরিকে শরিকে গন্ডগোলের জের ওটা। লোকটা নাকি বাঁচেনি। মানুষ মরে গেলেও জমি বিক্রি হওয়া আটকে থাকে না। কমলদেরও উঠে যেতে বলা হয়েছিল। তখন কমলদের বাবারা সব শরিক এক হয়ে মামলা করতে লাগল। মামলা বহুদিন চলেছিল। মামলার খরচ নিয়ে কমলদের বাবা-কাকাদের মধ্যে ঝগড়া হত। একবার মনে আছে কমলদের ওই বাড়িতে শাবল কুড়ুল নিয়ে একদল লোক এল। মেঝেতে যত মার্বেল ছিল তুলে নিয়ে গেল। সেখানে সিমেন্ট বালি দিয়ে ভরাট হল। ১৯৮০ নাগাদ পুকুরেও মাটি পড়তে লাগল। লরি লরি মাটি। তারপর প্লট করে বিক্রি হয়ে গেল। এখন মিত্তিরবাগানের যেটা রিকশাস্ট্যান্ড, তার নাম বড়ঘাট। পুকুরের প্রধান ঘাটটা ওখানেই ছিল। মিত্তিরবাগানে এখন কম্পিউটার সেন্টার, বিউটি পার্লার, জিম, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, কিন্ডারগার্টেন স্কুল। পরের বাড়িটা এখনও আছে, পাড়ার একমাত্র বেমানান বাড়িটা। ভাঙা ঝুরঝুরে। গায়ে বটগাছ গজিয়েছে। কেলিয়ে রয়েছে ইট। ছাতের উড়ন্ত পরিটার ডানা নেই বহুদিন, ঠ্যাংও নেই।

কমলের ঠাকুরদার ছিল আট পুত্র, চার কন্যা। আর কমলের বাবার ছিল পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা।

কমল পুত্রদের মধ্যে চার নম্বর।

কমলের এক নম্বর দাদা লন্ড্রির ব্যবসা করে। যখন মিত্তিরপুকুরটা বেঁচে ছিল, ব্যবসা তখনই শুরু করেছিল। দু'নম্বর বরানগর মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি। মিউটেশন ডিপার্টমেন্টে বহুদিন ছিল। একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। ও-বাড়িতেও একটা ঘর তালা দিয়ে রেখেছে। তিন নম্বর সাইনবোর্ডে লেখা থেকে চুল্লু অনেকরকম বিজনেস করেছে, কিছুতেই দাঁড়াতে পারেনি। প্রচুর দেনা নিয়ে সুইসাইড করে। ও নাকি ব্যাচেলার ছিল। মৃত্যুর পর দুজন মহিলা নিজেদের স্ত্রী দাবি করে সম্পত্তি চাইল। কমলের দু'নম্বর মিউনিসিপ্যালিটি-দাদা বলল, সম্পত্তি দাবি করার আগে ওর বাজারের দেনা মেটাও। তারপর ওরা আর তেমন কিছু বলে না। একজনের কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল। লাল টেরিলিনের জামা পরানো। চোখে কাজল। মহিলাটি বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে বলল তবে এরে কিছু টাকা দাও। কী করে খাওয়াব। কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল ভদ্রঘরের মেয়ে নয়। দেহপসারিণীও হতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটির দাদাই কেসটা ম্যানেজ করেছিল। কমল চতুর্থ। পাঁচ নম্বর ভাই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। বাইরে বাইরেই থাকে। রাঁচিতে বাড়ি করেছে। ভাইদের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ রাখে না।

নায়েববাড়িটার তিনটে ঘর এবং বারান্দার অংশ ভাগে পেয়েছিলেন কমলের বাবা। ওই তিনটে ঘরেই পাঁচ ভাই, দুই বোন মানুষ হয়েছে। বারান্দার একদিক ঘিরে রান্নার ব্যবস্থা ছিল। কমলের বাবার যখন মৃত্যু হয় কমলের বয়েস তখন কুড়ি। বিএসসি পাশ করেছে। কেমিস্ট্রিতে অনার্স ছিল। কোনওরকমে অনার্সটা বজায় রেখেছিল। ওই নম্বরে এমএসসি-তে চান্স পাওয়া যায় না। সব বাঙালি যা করে ও তাই করত। টিউশনি। সঙ্গে টাইপ শেখা। ও কাজ পেল একটা ছোট জায়গায়, যেখানে সিলভার নাইট্রেট তৈরি হয়। তখনও তো কম্পিউটারের যুগ আসেনি, ছবি ছাপতে ব্লক তৈরি করতে হত। আর ব্লকের জন্য দরকার হত সিলভার নাইট্রেট। চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় তখন অনেক ছোট ছোট রুপোর দোকান ছিল। ওখানে রুপোর কয়েন কিনতে পাওয়া যেত। সেই রুপোর কয়েন থেকে সিলভার নাইট্রেটের ক্রিস্টাল তৈরি হত। সেই সিলভার নাইট্রেট সাপ্লাই করতে হত ঈগল লিথো, বসুমতী, যুগান্তর এসব জায়গায়। ল্যাবরেটরিতে মাত্র তিনজন। মালিক, কমল আর একজন।

মালিক একদিন নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়ে নেয়। ভুল করে নয়, ইচ্ছে করে। একটা ছোট্ট সুইসাইড নোট লিখে রেখে গিয়েছিল—'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী রুপো।' পুলিশ বলেছিল রুপো নিশ্চয়ই কোনও মেয়ের নাম। লোকটার পকেটে ছিল পঞ্চম জর্জের ছবি খোদাই করা দশ-বারোটা রুপোর টাকা। আসলে রুপোর দাম ক্রমেই বাড়ছিল। চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার কাছেই বারাঙ্গনা পল্লী—সোনাগাছি। ওখানকার মেয়েরা আগে বাবুদের কাছে রুপোর টাকাই পেত। পরে কাগজের টাকা এলে জমানো

রুপোর টাকা বিক্রি করে দিত। এ কারণেই রুপোর দোকানগুলো ও পাড়াতেই। রুপোর টাকা কিনলে রুপোর বাটের চেয়ে সস্তা পড়ত। কিন্তু পুরোনো রুপোর কয়েনের জোগান কমে যায়। আর এদিকে ব্লক তৈরির জন্য সিলভার নাইট্রেট নির্ভরতা কমতে থাকে। অন্য প্রযুক্তি আসে। পুরোনো প্রযুক্তি মরে যায়। প্রযুক্তি মানুষ মারে। মানুষই প্রযুক্তি বানায়, কিন্তু প্রযুক্তির কাছে মানুষ অসহায়।

এরপরের চাকরিটা টাইপিস্টের। গোপাললাল ঠাকুর রোডে এক লেদ কারখানার মালিকের ছেলেকে পড়াত। সেই ভদ্রলোক বললেন, একজন টাইপিস্ট দরকার। ওর তিন-চারটে কারখানা। রেলে মাল সাপ্লাই করত। জেসপেও। ওদের চিঠিপত্র টাইপ করতে হত। কী লিখতে হবে সেটা বাংলায় বলে দিলে কমল কোনওরকমে ম্যানেজ করে নিত। এসব কাজে ভুল ইংরেজিতে কোনও অসুবিধে হয় না। তখনই রাত্রে ডিএমএস-এ ভর্তি হয়। হোমিওপ্যাথিকে ভালোবেসে নয়, যার নাই কোনও গতি সে পড়ে হোমিওপ্যাথি। এরকম একটা প্রবাদবাক্য চালু ছিল সেসময়।

৫

দু-দুটো অত্মহত্যা দেখে ফেলল কমল। ওর দাদা, আর ওর অন্নদাতা। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে বারবার বলছে প্রাণশক্তির কথা। ভাইটাল ফোর্স। ভাইটাল ফোর্স ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না কমল। রাত্রে ক্লাস করতে করতে, সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিয়োরেন্টুর শুনতে শুনতে, সামান্য ওষুধে দেহের মধ্যেকার প্রাণশক্তির উত্থানের কথা শুনতে শুনতে মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। জীবনে কোথাও আনন্দ নেই মনে হত। চৈত্র মাসের ঝড়েও নয়, আম-বকুলের গন্ধেও নয়। আনন্দ যেন একটা শব্দমাত্র; আনন্দবাজার পত্রিকার মাথায় থাকে। বাড়িতে সবসময় অশান্তি। ঠিকমতো শোবারই জায়গা নেই। পড়ার জায়গা তো ভাবাই যায় না। দাদাদের সংসারে বাড়ছে। মায়ের সঙ্গে খিটিমিটি বাড়ছে। চাকরিতেও বেদম খাটুনি। লোকটার ব্যবসা বাড়ছে, ফলে চিঠির পরিমাণও বাড়ছে, কিন্তু মাইনে বাড়ছে না। হোমিওপ্যাথি পড়তেও ভালো লাগছিল না। যারা পড়াচ্ছেন তাঁরা দু'-শ'বছরের পুরোনো তত্ব আউড়ে যাচ্ছেন। অ্যালোপ্যাথির নিন্দা দিয়ে ক্লাস শুরু হত। যেমন—আজ পড়াব স্কিন ডিজিজ বা চর্মরোগ। খোস, পাচড়া, দাদ, খুসকি এসব। অ্যালোপ্যাথ ব্যাটারা এর ওপর মলম লাগায়। মূর্খরা জানে না এটা বাইরের রোগ নয়, ভিতরের রোগ। বাইরে যেটা দেখি সেটা উপসর্গ। দেয়ালে 'ড্যাম' লেগে গেলে কি রং করলে সুরাহা হবে? রং খসে যাবে। চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী

হবে—একটা গান ছিল না! ছোটবেলায় শুনতাম। ওদের চোখের নজরেই গোলমাল। এই রোগগুলোর শিকড় হল রক্তে। আমরা ভিতর থেকে চিকিৎসা করি...।

কমল প্রশ্ন করলে ঠিকমতো উত্তর পেত না। কেন ওষুধের শিশিটা দশবার ঝাঁকালে ওষুধের শক্তি বেড়ে যাবে? উত্তর নেই। স্যারেরা বলেন—হ্যাঁ, হানিম্যান সাহেব বলে গেছেন, তাই সত্য। তত্ত্ব বলছে যত ডাইলিউট করবে ওষুধের শক্তি বাড়বে। কেন এটা হবে? একজন স্যার বললেন—যত বেশি ডাইলিউট হয় আয়নিফিকেশন বেশি হয়। কিন্তু কমল তো কেমিস্ট্রি পড়েছিল। ওখানে অসোয়াল্ডের ডাইলিউশন থিওরি পড়েছে, আরহেনিয়াস পড়েছে। ওখানে দ্রবণীয়তার সঙ্গে আয়নিফিকেশনের একটা সম্পর্ক ছিল বটে। কিন্তু সালফার বা আর্সেনিক বা কার্বন তো আয়নাইসড হয় না, আর নুন জাতীয় যেসব কম্পাউন্ডের আয়ন হয় তারও একটা সীমা আছে। যেমন নুন মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড। জলে গুলে গেলে কিছুটা সোডিয়াম আর ক্লোরিন একটু আলাদা হয়ে যায় আর সোডিয়াম একটু পজেটিভ, ক্লোরিন একটু নেগেটিভ থাকে। এগুলোকে বলে আয়ন। যত বেশি পাতলা দ্রবণ হয়, আয়নের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু এর একটা সীমা আছে। গন্ধক, কয়লা, ধাতু এসবের আয়ন হবার কোনও প্রশ্নই নেই। কার্বন বা সোনা বা রুপো তো দ্রবীভূতই হয় না, অথচ কার্বোভেজ ওষুধ আছে—সবজি পোড়ানো কার্বন দিয়ে তৈরি। কিউপ্রাস আছে—তামা। অরাম আছে—সোনা। অরাম সোনার ল্যাটিন নাম।

থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় একদিন এক জাঁদরেল স্যার, যাঁর তখনই একশো টাকা ফি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল কমল, স্যার, মনে করুন আপনাকে এক শিশি সালফার টু হান্ড্রেড এবং আর্সেনিক টু হান্ড্রেড দেওয়া হল, কিন্তু লেবেল নেই, ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, আর দেওয়া হয়েছে একটা আধুনিক ল্যাবরেটরি। আপনি কি পারবেন কোনটা সালফার আর কোনটা আর্সেনিক বলতে? স্যার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। একটু আমতা আমতা করে বললেন, না। ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করলে দুটোতেই শুধু অ্যালকোহলই পাব। আর কিছু নয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধের টেস্ট ল্যাবরেটরিতে হয় না, মনুষ্যশরীরে হয়। শ্বেতপ্রদর যাতে কমবে সেটা সালফার, আর দাস্ত হচ্ছে, খুব পিপাসা, জল খাচ্ছে, জল খেয়েই বমি করছে—এমন রুগি যে ওষুধে ভালো হচ্ছে সেটাই হল আর্সেনিক।

কমল খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারল না। কমল জানে, কোনও হোমিওপ্যাথি ওষুধের তিরিশ শক্তির পর এক আউন্স ওষুধে একটা অণুও পাওয়া যাবে না। অথচ বলা হচ্ছে যত বেশি ডাইলিউট হবে, ওষুধের শক্তি তত বাড়বে। কীসের শক্তি?

নাকসভোমিকা একটা ভেষজ। নাকসভোমিকার নির্যাস অ্যালেকোহলে দ্রবীভূত করা হল। সেই নির্যাসের একফোঁটা এক লিটার অ্যালকোহলে ফেলা হল। সেই এক লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত এক ফোঁটা আরক থেকে এক ফোঁটা নিয়ে একশো লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত করা হল। তার থেকে এক ফোঁটা আমরা জলে মিশিয়ে খাচ্ছি। যদি ওষুধকে আরও শক্তিশালী করতে চাই যেমন ওয়ান-এম, টু-এম টেন-এম, তাহলে আরও আরও তরলীকরণ করতে হবে। এর মানে মিলিয়ন।

তার মানে ওষুধে কোনও ভেষজ থাকছে না, থাকছে ভেষজের স্মৃতি। থাকছে ভেষজের ইতিহাস। তাহলে ওষুধের পরিবর্তে আমরা ইতিহাস খাচ্ছি। স্মৃতি খাচ্ছি। যে জলটা এব্রেশ রেডিক্স বলে খাচ্ছি, তাতে আছে কোনও একসময়ের ওলটকম্বলের স্মৃতি। মেয়েদের ঋতুকালে তলপেটের ব্যথায় কাজ দেয়। কিন্তু কোনও বায়োকেমিস্টের বাপের সাধ্য নেই 'এব্রেশ রেডিক্স থার্টি'র কোনও শিশি থেকে কোনও অ্যালকালয়েড বার করার।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় একটা প্রজেক্ট করেছিল। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ভিতরের রহস্যটা বের করার চেষ্টা করেছিল। সালফার ২০০, আর্নিকা ২০০, পালসেটিলা ২০০ এরকম বেশ কিছু স্যাম্পেলের বিশ্লেষণ করেছিল, কোনও তফাত পায়নি। স্যাম্পেলগুলোর স্পেস্ট্রোগ্রাফ ও করা হয়েছিল—বর্ণালী বিশ্লেষণ। সব একই রকম। অ্যালকোহলের বর্ণালী যেমন হয়। মাদার টিংচার এবং ৬ মাত্রার ওষুধের ক্ষেত্রে পার্থক্য বোঝা গিয়েছিল কিছু। যত বেশি মাত্রা, ওষুধটা তত পাতলা। বেশি ডাইলিউশন। বলা হয় বেশি মাত্রার ওষুধ বেশি শক্তিশালী। এর কোনও ব্যাখ্যা নেই।

অথচ সারে। রোগ সারে। থুজা দিয়ে বহু আঁচিল সারিয়েছে। চায়না দিয়ে, নাকসভোমিকা দিয়ে পেটফাঁপা সারিয়েছে। তাহলে ব্যাপারটা কী? কীভাবে সারে? কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না কমল। যদিও খুব একটা যুক্তিবাদী নয় কমল। কমল ঠাকুর দেবতা দেখলে প্রণাম ঠুকলেও প্রমাণ ব্যাপারটাকে কে না ভালোবাসে। জ্যামিতির উপপাদ্য যতক্ষণ প্রমাণ না হত ততক্ষণ নম্বর পাওয়া যেত না। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যালে তো প্রুফটাই আসল।

কিন্তু হোমিওপ্যাথির প্রুফটা হচ্ছে মানুষের শরীর। শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা গেছে রোগ সারে। হোমিওপ্যাথির মূল কথা হল—সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিয়োরেন্টুর। মানে সমান জিনিস সমান জিনিসেই সারে। একটা প্রবাদ আছে, বিষে বিষে বিষক্ষয়। বাংলা হোমিওপ্যাথি বইতে যা লেখা হয় সদৃশ বিধান।

কাঁচা কুইনাইনের রস কোনও সুস্থ মানুষকে খাইয়ে দিলে নাকি তার কম্প দিয়ে জ্বর আছে। সেই কুইনাইনকেই সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করলে কম্প দিয়ে জ্বর আসার যে উপসর্গ তা কমে যায়। আর্সেনিক সুস্থ মানুষকে খাওয়ালে তার বমি হবে, দাস্ত হবে, আবার সূক্ষ্ম মাত্রায় যদি আর্সেনিক প্রয়োগ করা যায় তাহলে দাস্ত বমির উপসর্গ ভালো হয়ে যায়। এটাই হল হ্যানিমানের তত্ব। কিন্তু সূক্ষ্ম মাত্রাটা নিয়েই তো ঝামেলা। আর্সেনিক দুশো শক্তির এক ফোঁটা ওষুধে একটাও আর্সেনিকের অ্যাটম পাওয়া যাবে না। তবে?

আবার সবসময় কি এই তত্ব মানা হচ্ছে? কবিরাজি মতে হার্টের রুগিদের অর্জুন গাছের ছাল খাওয়ানো হয়। কিন্ত হোমিওপ্যাথির মাস্টারমশাইরা তো বলছেন হার্টের রুগিকে অর্জুনের মাদার টিংচার দাও। মানে আরক। সূক্ষ্ম মাত্রার কথা তো বলা হচ্ছে না। কাঁচা থুজা খেলে বর্ধিত মাংসপিণ্ড গজায়। গজায় না। তবে?

প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। কমল ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলে ভালো আছি ডাক্তারবাবু, কেউ বলে ভালো নেই। নিজে সর্দি জ্বর মাথাধরা পেট খারাপে হোমিওপ্যাথিই খায়। কখনও কমে, কখনও কমে না। তখন অ্যালোপ্যাথি খায়। আবার অ্যালোপ্যাথি-ফেরত কোনও কোনও রুগি কখনও কমলের কাছে আসে। কমলের এতে তেমন কোনও আনন্দ হয় না। কমলের ওষুধে কিডনির পাথর বহুবার প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেকের। অ্যালোপ্যাথরা বলেছে বেশি জলটল খেলে এমনিতেই কিডনির পাথর বেরিয়ে যায়। হয়তো যায়। কমল হোমিওপ্যাথিই সত্য—এরকম তীব্র মতবাদে বিশ্বাসী নয়। নির্বিকল্প কর্ম করে যায়। কর্ম করো ফল চেও না গোছের। কিন্তু ফল না হলে রুগি সন্তুষ্ট হবে কেন? কিন্তু কিছু কিছু ফল ফলে নিশ্চয়ই। নইলে চেম্বারে রুগি হবে কেন?

ওখানে একটা যুক্তিবাদী সমিতি আছে। ওরা একটা পত্রিকা দিয়ে যায় মাঝে মাঝে। ওখানে হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার থাকে। হোমিওপ্যাথিকে বলা হয় প্লাসিবো। প্লাসিবো হল একধরনের মানসিক সান্ত্বনা বা এমন মানসিক অবস্থা যখন প্রবল বিশ্বাসে কোনও রোগ সেরে যায়। যেমন অনেক ইনসমনিয়ার রুগি আছে যাদের প্রত্যেকদিন ঘুমের বড়ি দরকার। তারপর এমন হয়ে গেল যে ঘুমের বড়ি ছাড়া ঘুম হয় না। সেরকম রুগিকে যদি ঘুমের বড়ির পরিবর্তে একইরকম দেখতে চকের বড়ি দেওয়া যায়, দেখা যাবে ঘুম হচ্ছে। এখানে ওষুধ কাজ করছে না, বিশ্বাস কাজ করছে। একইরকম ভাবে ‘রেইকি’ মানুষের উপর কাজ করে। রেইকিও হল এক ধরনের প্লাসিবো। রেইকি মানে স্পর্শ চিকিৎসা। যারা রেইকি করেন, তাঁরা নাকি স্পর্শের মাধ্যমে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেন রুগির শরীরে।

রুগি বিশ্বাস করে এতে ওর ভালো হচ্ছে। একই যুক্তিতে তাবিজ, কবচ, মাদুলি, জলপড়া, ফুঁ, ঝাড়ফুঁক সবই প্লাসিবো। হোমিওপ্যাথিকে জলপড়া-ঝাড়ফুঁকের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না কমল।

কমল নিজেও দু-একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে নিজের মতো করে। হোমিও-বইতে আছে গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে সাইলেসিয়া কয়েকবার খাইয়ে দিতে হয়।

মাছের কাঁটা-ফোটা রোগীকে সাইলেসিয়া দিয়ে বলেছিল বারবার খাবেন। কাঁটা গলিয়ে দেবে। কয়েক ঘণ্টা পরে সেই কাঁটা-ফোটা লোকটা জানিয়ে দিল কাঁটা গলে গেছে ডাক্তারবাবু...।

পরদিনই মৃগেল মাছের ঝোল ছিল দুপুরে। মাছের ভিতর থেকে দুটো সূক্ষ্ম কাঁটা বেছে নিয়েছিল কমল। সাইলেসিয়ার মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিল। তিনদিন রেখেছিল কাঁটাটা। গলেনি।

তাহলে?

প্লাসিবো তো বিশ্বাসসঞ্জাত। একটা শিশু, যাকে বলে দুধের শিশু, তার আবার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কী? শিশুদের তো অসুখ সারে। দুধ তুলে দেওয়া, পাতলা দাস্ত, সর্দি-কাশি কম তো সারায়নি কমল। এসব তো প্লাসিবো হতে পারে না।

জন্তুদের কি প্লাসিবো হয়? জন্তুরা কি শুনেছে কখনও যে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর...। জন্তু-জানোয়ারদের ওপর কি হোমিওপ্যাথির প্রয়োগ হয়েছে কখনও? কমল ভেবেছিল নিজেই পরীক্ষা করবে। তখনও কমলের চেম্বার খুব একটা জমে ওঠেনি। রুগিপত্র খুব একটা হত না। ফলে অলস চিন্তা-ভাবনার জন্য অনেকটা সময় পাওয়া যেত। ভেবেছিল কুকুরকে সিনা খাইয়ে দেখবে কৃমি বেরোয় কিনা। কিন্তু কুকুরকে ওষুধ খাওয়ানো মুশকিল। মাংস বা বিস্কুটের মধ্যে এক ফোঁটা মিশিয়ে দিলে তত্ত্ব অনুযায়ী ওষুধের গুণ থাকবে না। তাছাড়া ওদের গৃহপালিত কোনও কুকুর নেই। রাস্তার কুকুরকে ওষুধ খাওয়ানোর পর সেই নির্দিষ্ট কুকুরটির মলত্যাগ পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। ওদের বাড়ির পাশে একটা ছোটখাটো খাটাল ছিল। গোয়ালাদের বলে রেখেছিল কোনও গরুর পেট খারাপ হলে খবর দিতে। কোনওদিন কেউ খবর দেয়নি। কোনও গরু-ছাগলের গ্যাস-অম্বল হয় কিনা জানে না কমল। কোনও গরু-ছাগলকে ঢেকুর তুলতে দেখেনি কমল। বাড়ির কাছে একটা মুদি দোকান ছিল। মুদিওলার কয়েকটা ছাগল ছিল। শিশু ছাগল। ছাগলদের লক্ষ করত কমল। শিশু-ছাগলরা শিশু অবস্থা থেকেই খুব সুন্দর নাদি ছাড়ে। মানবশিশুরা ছোটবেলায় পাতলা পায়খানা করে। ক্রমশ শক্ত হয়। কিন্তু ছাগলদের তা নয়। ছাগলদের পাতলা পায়খানা করতেও সচরাচর দেখত না। একদিন দেখেছিল।

মলের রং কিঞ্চিৎ সবুজাভ। যা ইপিকাকের লক্ষণ। ইপিকাকের রুগির জিভটা সাদা হওয়ার কথা। কিন্তু পেটটাও কামড়াবে। ছাগলছানাটা ভ্যা ভ্যা করছিল। হয়তো পেটটা কামড়াচ্ছিল। মুদিওলাকে একটা ইপিকাকের শিশি দিয়ে বলেছিল—ছাগলছানাকে চার ঘণ্টা অন্তর জলের সঙ্গে এক ফোঁটা করে খাইয়ে দিতে। মুদিওলা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কমলের দিকে। ভাবটা বোধহয় এমন—আগে তো বুঝিনি আপনার মাথায় ছিট আছে...। আসলে কমল একটা প্রমাণ চাইছিল। আসলে পরিত্রাণ চাইছে। মুদিওলা বলেছিল—ছাগলের ওষুধ ছাগলই খুঁজে নেবে। সারা দুনিয়ায় ওষুধ ছড়ানো আছে। আপনার ওষুধ দরকার নেই। কমল বলেছিল—আমি শুধু দেখতে চাই আমার ওষুধে ছাগলের রোগ সারে কিনা। পয়সা লাগবে না। আমি এমনিই দিচ্ছি। লোকটা হাতজোড় করে বলেছিল, দয়া করে ছাগলকে ওষুধ দেবেন না।

লোকটা কি বিশ্বাস করল না?

কিন্তু রুমা বলেছিল, আপনাকে আমার খুব বিশ্বাস। ভীষণ বিশ্বাস।

৬

রুমার অম্বল-টম্বল সারিয়েছিল কমল। ওষুধ না বিশ্বাসে কমল জানে না। রুমা দাঁত ব্যথার জন্যও হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতে আসত কমলের কাছে। কমল বলেছিল, দাঁত ব্যথার মতো অ্যাকিউট পেইন হোমিওপ্যাথিতে সারবে না। পেইনকিলার খেয়ে নিন। রুমা বলত, না। আপনিই ওষুধ দিন। আপনার ওষুধেই কমবে। কী দেবে কমল? আর্নিকা? নাকি কলোসিন্থ নাকি লিডম? লিডমের রুগিরা খুব নরম মনের হয়। ওর মন কি খুব নরম? একবার ডেইজি দিয়ে সারিয়েছিল কমল। কমল লিডম দিয়েছিল। পরের দিনই এসে রুমা হাসতে হাসতে বলেছিল, আপনি ধন্বন্তরি।

একদিন রুমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কমল—আপনি কি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন? রুমা বলেছিল, আপনাকে বিশ্বাস করি, ব্যস। রুমা মাঝেমাঝেই আসত। অসুখ না থাকলেও। একবার এসে বলল, কাশি হচ্ছে, বুকে কফ। স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করেছিল কমল। জোরে শ্বাস বলার আগেই জোরেই শ্বাস পড়ছিল রুমার। কমল বলেছিল কই, কফ-টফ তো দেখছি না কিছু...। রুমা বলেছিল আছে, আছে, ভালো করে দেখুন...।

কমল ভাবছিল বলবে, এবার ভালো করেই দেখব কিন্তু...। বলতে পারেনি। বলেছিল কিচ্ছু নেই। নুন জলে গার্গেল করুন...।

রুমার মা মারা গেলেন। রুমার বাবা অনেক আগেই মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। রুমার বাবার কোনও ছবি ছিল না বাড়িতে। রুমার মামাবাড়িও ছিল না। রুমা বলল, এবার কী হবে আমার...।

রুমাদের ওই ভাড়াবাড়িতেই চলে গেল কমল। তার আগে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে নিল। কমলের বাড়িতেও অশান্তি বেড়ে গিয়েছিল খুব। থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কমল যেন একটা আশ্রয় পেল। কমলের বয়েস তখন উনত্রিশ।

রুমাদের বাড়িটা ছিল টিনের চালের। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনেছে বর্ষা জুড়ে। সামনের বারান্দায় দর্মার বেড়া দিয়ে রান্নাঘর। ঘনঘন লোডশেডিং হত সেসময়ে। বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকত চাঁদের আলো। কুমড়ো ছেঁচকির সঙ্গে চাঁদের আলো মাখিয়ে রুটি খেত। শুক্লপক্ষে ইচ্ছে করেই বাতি নিভিয়ে বারান্দায় বসত ওরা। রুমার গালে চাঁদের কোল্ড ক্রিম পড়ত, দু'হাতে মাখিয়ে দিত কমল। চাঁদের আলোকে ভালো কথায় জ্যোৎস্না বলে। জ্যোৎস্না বলতে ভালো লাগে না কমলের। জোছনাই ভালো। জোছনার ইংরেজি হল মুনলিট। ইংরেজি শব্দটার মধ্যে কোনও মায়া নেই। কোনও জোছনা নেই। জোছনায় কী যে মন ভালো হয়ে যায়...। ডাক্তাররা তো বলে, সকালে হাঁটুন, বেশি করে জল খান, কেন বলে না গায়ে জোছনা মাখান? জোছনায় স্নান করুন। একটা যদি এরকম ওষুধ বানানো যেত—জোছনাইসিয়া...বাংলায় তো ওষুধের নাম হয় না, বাংলা ওষুধের নামে ওষুধের মান থাকে না। মুনলিটিয়া রাখা যেতে পারে। স্থির জলের মধ্যে চাঁদের ছায়া পড়বে, সেই জল শিশিতে ভরে ঝাঁকিয়ে নাও। মনখারাপে খাও।

খুব চাঁদ খেয়েছে ওরা বস্তিজীবনে। হনিমুনে গিয়েছিল চারবছর পর। চাঁদনি রাতে চাঁদিপুর। আর সেখানেই প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ। স্রাব।

ঋতুপ্রাবল্য আগেও ছিল। হোমিওপ্যাথিতে কখনও কিছুটা কম ছিল, কখনও বেশি। কিন্তু চাঁদিপুরে অপরিমিত রক্তস্রাবে ভয় পেয়ে গেল কমল। কোনওমতে ফিরে এসে ডাক্তার দেখানো, নানারকম পরীক্ষা এবং জানা গেল ওভারিতে সিস্ট। তখনও এমআরআই দূরের কথা আলট্রাসনোগ্রাফিও এতটা সহজলভ্য ছিল না। এক্সরে-তে ওভারির সিস্ট ধরা যায় না। অনেক ঝামেলার পর রোগ ধরা পড়ল। কমল ওর স্যার, কলকাতার এক নম্বর হোমিওপ্যাথকে দেখাল। উনিও কিছুদিন প্লাটিনা, থুজা, হ্যামামেলিস ইত্যাদি দিলেন। কমল বলল খাও, ভালো হয়ে যাবে। এতবড় ডাক্তার বলেছেন যখন তোমার টিউমার মিলিয়ে যাবে। কিন্তু রক্তপাত বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত অপারেশনই করতে হল। অ্যাবডোমেন খুলে দেখা গেল জরায়ুর ভিতর ছড়িয়েছে দানা দানা অর্বুদ। ওগুলো চেঁচে বার করা সম্ভব

নয়। রেখে দিলে অর্বুদগুলো আরও বড় হয়ে যাবে। ফলে দুটো ওভারি, ফ্যালোপিয়ান টিউবসমেত পুরো জরায়ুটাকেই বাদ দিতে হল। যার ডাক্তারি নাম হিস্টেরেকটমি। তখন রুমার বয়েস মাত্র চৌত্রিশ। কমল পঁয়ত্রিশ।

৭

আজ কমল সাতান্ন। ফাস্টিং সুগার একশো ষাট। খুব বেশি নয়, হাঁটাহাঁটি করলে, আর খাওয়াদাওয়া নিয়মমতো করলে বিনা ওষুধেই ঠিকঠাক থাকতে পারে। হোমিওপ্যাথি ওষুধ খায়। রুমার বয়স ছাপ্পান্ন হলেও বয়েস অনেক বেশি দেখায়। মাথার চুল পেকে গেছে, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। হাঁটু এবং কোমরে ব্যথা। অস্টিওপোরেসিস। অল্পবয়সে ওভারি বাদ যাওয়ার কারণে ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন ইত্যাদি হরমোনের অভাবে হাড়ের ক্ষয় হয়েছে। হ্যানিম্যানের বইতে এইসব বাত-বেদনার লক্ষণভিত্তিক ওষুধের কথা বলা আছে, কিন্তু ওষুধে কোনও কাজ হয় না। ব্যথাও কমে না। বেশি ব্যথা হলে পেইনকিলার খায় রুমা। অনেকসময় কমলকেই ওষুধ কিনে আনতে হয়। পাড়ার দোকানদার বলে, কী ডাক্তারবাবু? অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কিনছেন? কমল বলেছে অ্যালোপ্যাথেরাও হোমিওপ্যাথি খায়।

সত্যিই খায়। কমলের দুজন পেশেন্ট আছে যারা অ্যালোপ্যাথ। একজন সাইনাসের ক্রনিক রুগি, অন্যজন প্রতিরাতে অশ্লীল স্বপ্ন দেখেন। ওরা চেম্বারে আসেন না। এমপি যেমন এমএলএ-র বাড়ি আসে না, এমএলএ-রা এম পি-র বাড়ি যায়। ওই দু'জনই নাকি ভালো আছেন। তবে ডাক্তারদের বউরা চেম্বারে আসে। চেম্বারে রুগিপত্র মন্দ হয় না আজকাল। কেউ কেউ বহু দূর থেকে আসে। ওদের ধারণা কমলডাক্তার ধন্বন্তরী। ওর চেম্বারে বাচ্চারাই বেশি। ও যদিও বোর্ডে 'শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ' কথাটা লিখে রাখেনি তবুও শিশু-বিশেষজ্ঞ তকমা পড়ে গেছে একটা। কমল বাচ্চাদের ভালোবাসে। ওর চেম্বারের পর্দায় হনুমান ঝোলে। দেওয়ালে হাতির ছবি, ঘোড়ার ছবি। বাচ্চাদের আদর করে, স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

একটা বাচ্চা দত্তক নেবার কথা ভেবেছিল রুমা। কমল অরাজি ছিল না। মিশনারিস অফ চ্যারিটিজ-এর দরখাস্তও করেছিল, কিন্তু রুমা এ নিয়ে আর এগোল না। পরে কমল সন্দেহ করেছিল, এ ব্যাপারে কোনও জ্যোতিষীর আপত্তি ছিল। রুমার জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে। কমলের ততটা নেই। রুমা অবশ্য বলেছিল জীবনটা একটা তালে চলেছে, কী আর দরকার রুটিনটা চেঞ্জ করার। নিজের শরীরও ভালো নয়। একটা বাচ্চা আসলে ওর যত্ন-আত্তি করতে পারব না বাবা, থাক।

থাক তো থাক। এনিয়ে কমলও কোনও জোরাজুরি করেনি। কমল ওর চেম্বার থেকেই শিশুদের গায়ের গন্ধ, পেচ্ছাপ মাখানো ন্যাপির গন্ধ, দুধের গন্ধ, হাসির শব্দ, কাজলমাখা ঘুম চোখ, সদ্য দাঁত ওঠা মুখের হি-হি, এইসবই পেয়ে যায়। বাইরের সবকেই নিজের করে নিতে হয়, এই কাজটাই কঠিন। বসুধৈব কুটুম্বকম কথাটা বইতে লেখা থাকে বটে, কিন্তু নিজের জীবনে ঢুকিয়ে দেওয়াটা বড় কঠিন ব্যাপার। সিনেমা থিয়েটারে এসব দেখলে ভালোই লাগে।

কমল এখন গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটছে। ও জানে আস্তে আস্তে হাঁটলে রক্তের চিনি পোড়ে না, কিন্তু কমল আস্তেই হাঁটে। তাড়াতাড়ি হাঁটলে হাঁটাটা উপভোগ করা যায় না। গঙ্গায় দু-চারটে নৌকো। হয়তো জেলে নৌকো। কিন্তু কোনওদিন জাল ফেলতে দেখেনি। পাড়ে এসে মাছ বিক্রি করতেও দেখেনি কমল। ছোটবেলায় দেখেছে ঘাটে ইলিশ বিক্রি হত। ধুতি আর ফতুয়া-পরা বাবুরা ইলিশের মুখে দড়ি বেঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে বাড়ি নিয়ে যেত। বর্ষাকালের গন্ধের মধ্যে ইলিশেরও অবদান আছে। বরানগরে পুরোনো বাড়িগুলোর পলেস্তারার গায়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। বাড়িগুলোর গা থেকে একটা গন্ধ উঠে আসছে, তার সঙ্গে মিশছে ইলিশ ভাজার গন্ধ...।

এখন বর্ষা প্রায় শেষ। ভাদ্র মাস। গাছগুলো ধোয়া, তাই সবুজ। গঙ্গার ধারের ঝুপড়িগুলো থেকে একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। ডাঁই করে রাখা বস্তা ভরা পলিথিন—প্লাস্টিক। দু'-চারটে বস্তা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উড়ে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। গঙ্গার ধারের এবড়ো-খেবড়ো পিচ রাস্তার পাশে বসে পায়খানা করছে একটি শিশু। পায়খানাটার রং চোখে পড়ল কমলের। সাদা রং। কাদার মতো। ওর তো জন্ডিস হয়েছে। চোখটা দেখতে ইচ্ছে করল কমলের। কমল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটা গঙ্গার জলেই শৌচকর্ম করে এল। এই জন্ডিসের কারণ যদি কোনও হেপাটাইটিস ভাইরাস হয়, তবে গঙ্গার জলে ওই ভাইরাস মিশল। ওই তো, পাশেই তো একটা লোক গঙ্গার জল মাথায় ঠেকাল, সূর্যপ্রণাম করল, তারপরই ওই জল দিয়ে কুলকুচি করতে থাকল। ছেলেটা উঠে এল। কমল বলল, একটু দাঁড়া। চোখটা দেখল। হলদেটে। হাতের নখও হলদেটে। কমল জিজ্ঞাসা করল, তোর পেচ্ছাপের রং কেমন?

ছেলেটা বলল, জানি না।

দেখিসনি?

উঁহু।

বমি বমি লাগে?

করি।

কী করিস?

বমি করি।

কতবার?

ছেলেটার অত ঝামেলার মধ্যে যায় না। আস্তে আস্তে ঝুপড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। ওর বয়স কত হবে? চার থেকে পাঁচের মধ্যে। ওর মা-বাবা কি জানে ছেলের জন্ডিস হয়েছে? জানলেও হয়তো ন্যাবার মালা ঝুলিয়ে দেবে। এখুনি চায়না থ্রি এক্স চারঘণ্টা পরপর খাওয়ানো দরকার, এবং দুবার চিলিডেনিয়াম মাদার টিংচার। কিন্তু ও তো প্রাতর্ভ্রমণে এসেছে। সঙ্গে ওষুধ রাখার কোনও প্রশ্নই নেই। কাল কি সঙ্গে করে ওষুধ নিয়ে আসবে? ওর ঝুপড়িটা চিনে রাখতে পারলে ভালো হয়। সব ঝুপড়িগুলোই একইরকম দেখতে। জায়গাটা চিনে নেবার চেষ্টা করল কমল। বটগাছ, তার তলায় কতগুলো রং-চটা শীতলা মূর্তি। ছেলেটা মাথা নীচু করে থপথপ পা ফেলে ওর ঝুপড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কমল ওকে ডাকে। এই, শোন। তোর নামটা কী বাবা? ছেলেটা উত্তর না দিয়ে ওর ঘরের দিকে যেতে থাকে।

কমল তো এরকম কত রুগিই দেখে রাস্তাঘাটে। মনটা তো এরকম হয় না। কত হিপারসালফারের ঘুংড়িকাশি ঘুরে বেড়াচ্ছে, সায়াটিকা-অ্যাসাইটিস ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেচে ওষুধ দেবার কথা মনে হয়নি কখনও। এর হলদেটে চোখের মধ্যে যেন মায়া ভরা ছিল। কমল একটু পা চালিয়ে বাচ্চাটির কাছে যায়। ওর মাথায় হাত দেয়। বলে তোর নামটা কী রে?

ছেলেটা বলে, আমিনুল।

হাতটা মাথা থেকে সরে যায়।

কমল পিছন ফেরে।

৮

পরদিন ভোরবেলায় ছেলেটার কথা মনে পড়ল কমলের। ওষুধটা কি সঙ্গে নেবে? নামটা আমিনুল শুনে উৎসাহটা যেন কমে গেছে। ধুর, নিতে হবে না—এই ভেবে চটিটা গলাল কমল। তারপরই ভাবল, আমি কি এতটাই সাম্প্রদায়িক? ছেলেটা মুসলিম বলেই ওষুধটা নিচ্ছে না সে? না না, তা নয়। ওর নামটা মণ্টু কিংবা বাবলা হলেও হয়তো ওষুধটা নিয়ে বেরোত না। কে আর ঝামেলা নিতে ভালোবাসে?

প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী দু'পাশ নিয়ে পিছলে যাচ্ছে। সবাইকে ধরে ধরে ওষুধ খাওয়াতে হবে নাকি?

একবার থমকে দাঁড়াল কমল। নিজেকে অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করার জন্যই হয়তো কতগুলো পুরিয়া বানিয়ে নিল। একটা খামে ভরল।

বাইরেটা বেশ ভালো। শেষ রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। হাওয়ায় একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। চুল্লিতে কোনও দেহ পুড়ছে না। হালকা ঠান্ডা হাওয়া। ওই শেতলা-রাখা বটগাছটার কাছে দাঁড়াল। ছেলেটা গতকাল যেখানে বসে মলত্যাগ করছিল, সেখানে একটু দাঁড়াল। কেউ নেই। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কমল। এক জায়গায় দেখল একদলা সদ্যকৃত মল। সাদাটে রং, থকথকে। কয়েকটা মাছি বসেছে। সেই ছেলেটারই।

কমল ঝুপড়িগুলোর কাছে গেল। কোনটা আমিনুলের ঘর কমল জানে না। কমল জোরে জোরে ডাকতে থাকে আমিনুল, ও আমিনুল...।

ঝুপড়িগুলো বৈচিত্রে ভরা। কোনওটার চাল কেবল পলিথিন, কোনওটার চাল টিন-দর্মা-খড় মেশানো। কোনও দেওয়াল থার্মোকলের, কোনও দেওয়ালে বাঁশের বেড়া, প্যাকিং বক্সের কাঠ, সিনেমার হোর্ডিং। একটা ঝুপড়ির চালে শুয়ে আছেন মমতা ব্যানার্জী। কোনও কাট-আউট।

কমল আবার ডাকে আমিনুল...এই আমিনুল...।

একটি বউ এগিয়ে আসে। চোখে জিজ্ঞাসা।

কমল বলে আমিনুলকে খুঁজছি।

—কেন?

—ওর তো একটা অসুখ হয়েছে। ওকে ওষুধ দেব।

—ওষুধ?

—হ্যাঁ।

—আপনি কে?

—ডাক্তার।

—ডাক্তার!

কমল মাথা নাড়ায়। বউটা বিশ্বাস করছে না। কমল বলে, গতকাল গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়াবার সময় ওকে সাদা পায়খানা করতে দেখলাম কিনা...। তাছাড়া ওর চোখটাও তো হলুদ। তুমি খেয়াল করোনি?

বউটা বলল, করেছি তো। পঞ্চাননতলার জলপড়া দিয়েছি। আখের রস খাইয়েছি। কমলের কেমন বিস্ময় লাগে। মুসলিম রমণী পঞ্চাননতলার জলপড়া খাইয়েছে? পঞ্চাননতলা হল কমলদের পুরোনো বাড়ির কাছে। কলকাতা যখন কলকাতা হয়নি, বরাহনগর ছিল একটা গ্রাম, তখনও পঞ্চাননতলা ছিল। একটা পুরোনো শিবমন্দির। চড়ক হয়। গাজনের সন্ন্যাসী হয় এখনও। কমলের মনে পড়ে ওর যে দাদা আত্মহত্যা করেছিল, সে একবার সন্ন্যাস নিয়েছিল। বামুন কায়েতরা সাধারণত এসব গাজন-টাজনের সন্ন্যাসী হয় না, কিন্তু ওর সেই দাদা হয়েছিল। পঞ্চানন ঠাকুরের সেবাইতরা বংশপরম্পরায় জলপড়া দেয়। বউটা জলপড়াই বলল। পানিপড়া তো বলল না।

কমল জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মুসলিম?

বউটা বলল, উঁহু...।

—তবে তোমার ছেলের নাম আমিনুল রেখেছ কেন?

—ছেলের বাপ রেখেছিল। ছেলের বাপ মুসলিম ছিল।

—ছিল বলছ কেন? এখন নেই?

—আমাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে।

—কোথায় গেছে?

—ওই পারে। লিলুয়া।

—কবে চলে গেছে?

—তিনবছর হয়ে গেল।

—তোমাদের চলে কী করে?

—খেটে খাই।

—কী কাজ করো?

—এই তো বাজার যাব। মাছ কুটব। আজ একটু দেরি হয়ে গেল।

ঘড়িটা দেখল কমল। পৌনে সাতটা।

—কী মাছ কোটো?

—সব মাছ। বাবুদের বউরা তো মাছ কুটতে জানে না, যাবার সময় চায়ের দোকান থেকে ছাই লিয়ে বাজার যাই....

—কত করে হয়?

—বেলা বারোটা পর্যন্ত থাকলে, ষাট-সত্তর টাকা হয়ে যায়।

—তোমার ছেলে কোথায়? আমিনুল?

—হাগতে গেছে।

—কখন?

—তা হল অনেক টাইম। সকালে বেরোলে ঘরে আসতে চায় না। গঙ্গার পাড়ে ঠায় বসে বসে লৌকো দ্যাকে। এক নম্বর—একের নম্বর হিজল দাগড়া ছেলে।

হিজল দাগড়া শব্দটা কতদিন পড়ে শুনল কমল। হিজল দাগড়া মানে একটু আলসে টাইপ। কোনও কাজে অনেকটা সময় লাগায়। এগুলো সব কলকাতার পুরোনো শব্দ। নিটপিটে, পাঁচপাচি, আগড়দম্বা, অনামুখো—এইসব কথাগুলো শোনাই যায় না আর। মা বলতেন....।

ছেলেটার মল দেখে এসেছে কমল। ওরকম সাদা, থকথকে, একদম চায়নার পেশেন্টের মল। ভাবল, ওর মায়ের কাছে রেখে যাবে। তবে একবার পেট টিপে লিভারটা দেখতে পেলে ভালো হত। এমনসময় দেখল ছেলেটা আসছে। একটা বড় পলিথিনের জ্যারিকেন, একটা কাদামাখা কাপড় টেনে নিয়ে আসছে আমিনুল। বউটা বলল, ভাটির মাল। গঙ্গা কত কি লিয়ে আসে। ভাঁটায় জল সরে গেলে পাড়ে রেখে যায়।

কমল বলে কাপড় কী হবে?

জোয়ার এলে থুপে কেচে লিব। সব বিককির হয়।

ছেলের মাথায় হাত দেয় কমল।

বলে, চিনতে পারছিস?

ছেলেটা কমলের মুখের দিকে তাকায়। বলে হ্যাঁ। হাওয়া-খাওয়া বাবু।

কাল কথা হয়েছিল মনে আছে?

ছেলেটা মাথা নাড়ায়।

কমল জিজ্ঞাসা করে কাল ক'বার বমি করেছিস?

ছেলেটা বলে, দু-তিনবার।

কমল বলে, একটু শুয়ে পড় তো...কোথায় শুবি?

ছেলেটা প্লাস্টিক পলিথিন ভরা বস্তাটার উপর শুয়ে পড়ে। দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দেয়। কমল পেটে হাত দেয়। লিভার প্যালপেট করে। বেশ বড় হয়েছে। একটু শক্তও। চিলিডোনিয়াম খাওয়া দরকার। কালমেঘের পাতার রসও ভালো।

কমল ছেলেটার মাকে জিজ্ঞাসা করল, কালমেঘ পাতা চেনো?

মাথা নাড়ায়।

কমল বলে, বাজারে ওঠে। মাসিদের বোলো। ওই পাতার একটু রস খাওয়াও। ওর রান্নায় তেল-মশলা দিও না।

মেয়েটা বলল, তরকারিতে হলুদও দিই না।

কমল বলল, হলুদ তো ভালো। হলুদ খেলে ক্ষতি হয় না। ওর পেচ্ছাপের রং হলুদ, তার সঙ্গে খাওয়ার হলুদের কোনও সম্পর্ক নেই।

বউটা মাথা মৃদু নাড়ায়। ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

বউটা বলে, আপনি ডাক্তার বলছেন, কী নাম?

—নাম বললে চিনতে পারবে?

—বাজারে কতরকম আলোচনা হয়, ডাক্তারদের নিয়েও আলোচনা হয়।

—আমার নাম কমল।

বউটা হঠাৎ বসে পড়ল। পা চেপে ধরল কমলের। আপনি কমল ডাক্তার? আমার কী ভাগ্যি। আপনার কত সুখ্যাত শুনি। আপনার ডাক্তারঘরে কী ভিড়। যেতে সাহস করি না। আপনি দেবতার মতো দেখা দিলেন। কোথায় বসাই, কী করি...।

—লোকে আমায় ভালো বলে? কমল শুনতে চায় আবার।

—খুব ভালো বলে। চিংড়ি বেচা গনা, ওর সারা গা জ্বালপোড়া করত। আপনার ওষুধ খেয়ে সারিয়েছে। একজন বাবু আসেন চারাপোনা কুটোতে। উনি বলেছেন আপনি চারাপোনার ঝোল খেতে বলেছেন তাই অন্য মাছ খায় না। এমন বিশ্বাস। উনি তিনমাস বাজারে আসেনি। হাসপাতালে ছিল। কি একটা যেন অসুখ। এখন আপনার ওষুধ খাচ্ছে। আপনি ওষুধ দিয়েছেন যখন আমার ছেলেও ভালো হয়ে যাবে। কমল জিজ্ঞাসা করে, কী নাম তোমার?

বউটা বলল, ঝর্ণা।

ছেলেটা বলে, ঝন্না না, জরিনা।

বউটা হাসে। বলে ঝর্ণা নামটাকে একটু জড়িয়ে বললে তো জরিনার মতোই শোনায়। আমার স্বামী জরিনা বলেই ডাকত। সেই দেখাদেখি এরাও জরিনা ডাকে। কিন্তু বাজারে ঝর্ণা। ঝর্ণাও যা, জরিনাও তা। আমি তো আমি।

নমাজ-টমাজ পড়ো? কমল জিজ্ঞাসা করে।

নমাজের মন্তর বড় কঠিন। আমার স্বামী শেখাবার চেষ্টা করত। আমার মুখস্থ হত না। আর চেষ্টা করিনি। মসজিদ দেখলে একটা পেন্নাম ঠুকে দি। পীরের থান দেখলেও। মন্দির, শনি, শিব যা দেখি পেন্নাম করে দি। ক্ষতি তো নেই। আমার মা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ত। মুখস্থ ছিল। আমার মা অনেক বড় সিঁদুরের টিপ পরত। কী সুন্দর লাগত...।

মা নেই?

না।

বাবা?

বাবাও নেই। আমার বাবা ছিল খুব বড়ঘরের লোক। বাবাকে মনে নেই। কী করে মনে থাকবে? বাবা যখন মরে যায় আমার তখন একবছরও হয়নি। তোমার বাবা কী করে মারা গেল? বউটা ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলে শুনেছি তো গলায় দড়ি দিয়েছিল। ঝিনঝিন করে কমলের শরীর। হঠাৎ প্রেশার বেড়ে গেল মনে হয়। কমল বউটাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বয়স কত ঝর্ণা?

ঝর্ণা বলল, কে জানে! পঁচিশ-তিরিশ হবে...।

ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে থাকে কমল। অপলক। কিছু আবিষ্কার করতে চায়। কমল বলে, তোমার বাবা যখন মারা গেলেন, তোমার মা তোমাকে তখন নিয়ে গিয়েছিলেন?

ঝর্ণা নীচের ঠোঁটটা উলটে খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, ক্যা জানে। আমার কিছু মনে নেই।

কমল তখন মনে মনে হিসেব করে দেখল ওর সেজদা মারা গেছে ঠিক আঠাশবছর আগে। লাল ফ্রক পরা মেয়েটাই কি তবে আজকের ঝর্ণা? বুকটা ধড়াস করে উঠল কমলের। না, হতেই পারে না। আঠাশবছর আগে তো কত লোকই মারা গেছে। এই রতনবাবুর ঘাটেই তো সারাদিনে পঁচিশ-ত্রিশ জন পুড়ছে।

কমল বলে ফেলল, তোমার বাবার নামটা জানা আছে? বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভিতর ধামসা বাজতে শুরু করল।

ঝর্ণার সেই একইরকম নিস্পৃহতা কিংবা তাচ্ছিল্য। নিজের বাবার নামটা কি মনে নেই আমার, কিন্তু পরের বাবা-টার নাম ছিল খগেন। হি হি। সবাই খিস্তিতে বলে বাপের নাম খগেন করে দেব। আমি বলি, আমার বাপের নাম তো খগেনই। আমার নিজের বাপ মরে যেতে মা যাকে বিয়ে করেছিল, তার নাম খগেন।

৯

পাশের বাড়িটা তরতর করে উঠে যাচ্ছে। মন্দার বাজারে সিমেন্ট লোহার দাম কিছুটা কমেছে, তার সুব্যবহার হচ্ছে। দেওয়ালগুলো হয়ে গেল। চাঁদের আলো আর আসে না। আসতে পারে না। দু'বাড়ির ফাঁকে একচিলতে আকাশ। ওই আকাশে কখনও তারা দেখা যায়, চাঁদ নয়।

রুমা বড্ড ভুগছে। কমবয়সে ওভারিটা বাদ দিতে হয়েছে। হরমোন পায়নি শরীর। হাড়গুলো ফোঁপরা। ক্যালসিয়াম বসছে না শরীরে। হোমিওপ্যাথির যাবতীয় বিদ্যা প্রয়োগ করেও লাভ হয়নি। ও বোধহয় পঞ্চাননের জলপড়াও খেয়েছিল। হোমিওপ্যাথিকে তো অনেকেই জলপড়া বলে। বরানগরে একটা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আছে। অনেকে এটাকে ডক্টরস ক্লাবও বলে। ওখানে বাইশজন ডাক্তার মেম্বার। ছ'জন হোমিও, একজন আয়ুর্বেদ। কয়েকজন অ্যালোপ্যাথ আছেন, ওদের হাতে পাথর বসানো আংটি। জামা খুললে হয়তো মাদুলিও দেখা যাবে। ওরাও হোমিওপ্যাথদের হ্যাটা করে। মিনারেল ওয়াটারের বোতল নিয়ে বলে একটু ঝাঁকিয়ে দিন তো দাদা, পোটেন্সি বাড়িয়ে দিন। কোনও চেনা-জানা লোকের ক্যান্সার হলে বলে—এই যে হোমিও দাদা, ক্যান্সারটা সারিয়ে দিন তো...। অনেক হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররা বলেন ক্যান্সার সারিয়েছে। কমলের বিশ্বাস হয় না। হোমিওপ্যাথিতে যে অন্য অসুখ-বিসুখ সারছে, এসবই বা কী করে সারছে তার কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না কমল। ক'দিন আগেই তো একজনের থুতনির আঁচিলটা পড়ে গেলে। আটবছরের পুরোনো আঁচিল। এটা ওষুধের দান নাকি হ্যানিম্যানবাবার আশীর্বাদ? একজন হোমিওপ্যাথকে জানে কমল, যে পুরিয়া বানিয়ে খামে ভরে হ্যানিমানের ছবিতে ছুঁইয়ে নেয়। ছবির ঠিক পায়ের কাছটায়।

রুমাকে নিয়ে গিয়েছিল কমল এক তিব্বতি কবিরাজের কাছে। রুমাকে কেউ সন্ধান দিয়েছিল ওই তিব্বতি কবিরাজের। ঠিকানা খুঁজে গেল ওরা। কবিরাজমশাই মুণ্ডিত মস্তক। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ঘরে দলাইলামা, বুদ্ধদেব এবং নানা বৌদ্ধ দেবীদের মূর্তি। কবিরাজের নাম তেনজিং মনসা ভুটিয়া। বললেন দলাইলামার সঙ্গে যেসব তিব্বতিরা ভারতে এসেছে, তাদের একটা বসতি আছে হিমাচল প্রদেশে।

সেখানে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মেডিকেল কলেজও আছে, যেখানে তিব্বতি চিকিৎসাশাস্ত্র শেখানো হয়। তিনবছর ওখানে পড়েছে সে। ওখানে কিছুটা আকুপাংচার, কিছুটা ম্যাকসিবুশনও শেখায়। ঘরময় কবিরাজি ওষুধের গন্ধ। শিশিতে ভরা সাদা, কালো, গোলাপি, বাদামি গোল গোল বড়ি।

নাড়ি দেখলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন খুন খারাব হো গিয়া। ফার্স্ট উই নিড টু পিউরিফাই হোল ব্লাড। ব্লাড পরিষ্কার করনে কা দাবাই জরুরি হোগা। ওদেরও সেই পুরোনো শাস্ত্র, পুরোনো বিশ্বাস। হাড়ের ক্ষয়, ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম এসব ওরা জানে না। আয়ুর্বেদের যেমন বায়ু-পিত্ত-কফ, হোমিওপ্যাথির যেমন সিফিলিফ, সোরিক, সাইকেসিস। পুরোনো শাস্ত্র সেই প্রাচীন অবস্থাতেই থেমে আছে। আজকের চীন কিন্তু ওদের পুরোনো চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছে, পরীক্ষা করেছে—আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রাচীন গাছগাছড়া শেকড়-বাকড়ের সঙ্গে মিলিয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক, এনজাইম, হরমোন থেরাপি। ওরা নিজেদের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিজেদের মতো করে এগিয়ে নিয়েছে।

ভারতে যখন ব্রিটিশরা আসে, ব্রিটিশ সৈন্য এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের চিকিৎসার প্রয়োজনে মেডিকেল কলেজ তৈরি করেন। দেশ থেকে তো ডাক্তার নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। দু'-আড়াইশো বছর আগে দেশীয় চিকিৎসার এতটা দুরবস্থা ছিল না। মেডিকেল কলেজে দেশীয় বিদ্যারই চর্চা হত। পড়তে আসতেন দেশীয় বৈদ্য সন্তানরা। পড়াতেনও দেশীয় বৈদ্যরা। বাংলা ভাষাতেই পড়ানো হত। দু'-একজন সাহেবও বাংলা শিখে পড়াতেন। বিভিন্ন আরক তৈরি হত, সেই সঙ্গে সঙ্গে শল্যচিকিৎসাও শেখানো হত। মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করা হিন্দুশাস্ত্রে খারাপভাবে দেখা হত। মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন ১৮৩৬ সালে। সে এক ইতিহাস।

কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার সিলেবাস পুনর্গঠিত হল। সাহেবরা একটা কমিশন করলেন। দেশীয় চিকিৎসার সমস্ত অধ্যায় বন্ধ করে দেওয়া হল। আমাদের শুধু ইউরোপীয় চিকিৎসা পড়তে হয়।

হোমিওপ্যাথিও তো ইউরোপীয় চিকিৎসা। হ্যানিম্যান সাহেব এর প্রবক্তা। ভারতে হোমিও চিকিৎসা এসেছিল ইংরেজদের হাত ধরেই। রাজেন্দ্রলাল দত্ত সেই ১৮৫১ সালে হোমিওপ্যাথি কলেজ তৈরি করেছিলেন। আর মহেন্দ্রলাল সরকার? কত বড় ডাক্তার ছিলেন তিনি। অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ধরলেন। ডা. প্রতাপ মজুমদারও কম কীসে? সেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই তো করছে

কমল। কিন্তু তৃপ্তি নেই। তিব্বতি ডাক্তার বললেন—দু'বছর ওষুধ খেতে হবে। রক্ত পরিষ্কার হলে পায়ের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা কমে যাবে।

কমল বেরিয়ে এসে রুমাকে বলল, দেখ ঠিক কমে যাবে। ধৈর্য ধরে খাও। কমে যাবে। কমবেই।

আসলে বিশ্বাস সংক্রমণ করতে চাইছে কমল। বিশ্বাস তৈরি হলে রোগ সারবে। প্লাসিবো! প্লাসিবো।

ট্যাক্সিতেই হঠাৎ চোয়াল ব্যথা করতে থাকল রুমার। ব্যথাটা হাতের কনুই পর্যন্ত গড়াল। লক্ষণ দেখেই কমল বুঝল এটা হার্টের গোলমাল। ট্যাক্সিকে ঘোরাল। সিদ্ধান্ত নিতে হবে হাসপাতাল না নার্সিংহোম। নার্সিংহোম হলে ভালো নার্সিংহোম। ওর মনে হল রুমার জন্য কিছুই করা হয়নি। বহুদিন কোথাও বেড়াতে যেতে পারেনি রুমার পায়ের জন্য। রুমার গয়নাগাটিরও শখ নেই। ও এখন যে জায়গায়, পিজি হাসপাতালেও যেতে পারে, বিড়লা হার্ট-এও যেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে বেশি টাকা নেই। নার্সিংহোমে ভর্তি করলেই প্রথমে গাদাখানেক টাকা দিয়ে দিতে হয়। রুমার বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাথায় হাত বোলাচ্ছে কমল। কমল বলল, একদম চিন্তা কোরো না। ড্রাইভারকে বলল, পি. জি হাসপাতাল।

১০

অল্পের ওপর দিয়েই গেল। কী করে রুমার রক্তে এতটা কোলেস্টেরল জমে গেল কে জানে! ঘি-মাখন এসব খাওয়াই হয় না বাড়িতে। অথচ কোলেস্টেরল ৩৮০। ট্রাইগ্লিসারয়েড দুশো সত্তর। এনজিওগ্রাফি করতে হল। আর্টারিতে ভালোমতন ব্লক ধরা পড়েছে। এসব তো আর হ্যানিমানের ভরসায় রাখা যায় না, বড় হার্ট স্পেশালিস্টকে দেখানো হয়েছে। অ্যাসপিরিনযুক্ত ওষুধ খেতে হচ্ছে, রক্ত যাতে সহজে জমাট না বাঁধতে পারে। আর ব্লকটা কীভাবে সারানো হবে তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এনজিওপ্লাস্টির কথা ভাবা হয়েছে। আবার একজন ডাক্তার বললেন, ওষুধ খেয়েই দেখা যাক না কিছুদিন। কেউ বললেন প্রাণায়ামই হল একমাত্র চিকিৎসা। কপালভাতিটা ঠিকঠাক করলে সব কোলেস্টেরল গলে যাবে। ব্লক-টক যা আছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেউ বলছে অর্জুনের ছাল ভেজানো জল রোজ সকালে খালি পেটে তিনমাস খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অর্জুনের জলও খাচ্ছে, প্রাণায়ামও একটু করছে, নিউস্প্রিন ক্লপিট্যাবও খাচ্ছে। আবার মন মানে না বলে স্পাইজেলিয়া থ্রি এক্সও খাওয়াচ্ছে কমল।

এখন দরকার একজন সবসময়ের লোক। পাওয়া যাচ্ছে না। বাসন মাজার মেয়েটিকে প্রচুর কাকুতি-মিনতি করে রান্নাটা করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অনেককেই বলেছে কমল, লোক পাওয়া যাচ্ছে না

কিছুতেই। আমিনুলের মায়ের কথা মনে পড়ল একবার। ওই সেবার, যেদিন আমিনুলকে ওষুধ দিতে গেল দরদ দেখিয়ে, সেদিন কী বুক ধড়াস ধড়াস সকলের। এক্কেবারে ল্যাকেসিস-এর সিম্পটম। সেই বুক ধড়ফড়ানি অনেকক্ষণ ছিল। ওই মেয়েটা, আমিনুলের মা ওর সেজদার মেয়ে হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। তাহলে আমিনুল তো কমলের নাতি হয়ে যাচ্ছে। কী মুশকিল।

কমল ভয়ে ভয়ে ওই পথ মাড়ায়নি বেশ কয়েকদিন। কেমন আছে ছেলেটা জানতে ইচ্ছে করেছিল খুব। সেই ইচ্ছে চেপে রেখেছিল। বরানগরের বাজারে তেমন যায় না কমল, সুতরাং আমিনুলের মায়ের সঙ্গে দেখা হবার কোনও সুযোগ নেই। কমল বেনেপাড়ার বাজারেই বাজার সারে। বরানগর বাজারটা ভালো। ওখানে মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছে করলেও আমিনুলের মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে ও যায় না।

কিন্তু একদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বেলা একটা নাগাদ চেম্বার থেকে বেরোচ্ছে কমল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আমিনুলের মা। সঙ্গে আমিনুল। কমলকে দেখেই পায়ে পড়ে গেল আমিনুলের মা। আপনার ওষুধে আমার আমিনুল ভালো হয়ে গেল। আপনি আর আসেন না, আপনার জন্য কতদিন দাঁইড়ে রইলাম, বাজার যেতে দেরি হয়ে গেল, তাই আপনার এখেনে এলাম। আপনার ওষুধ খেয়ে পরদিনই বড় বড় কিরমি বেরুল পাইখানার দ্বার দিয়ে। কত বড় কিরমি দেখা দেকি আমিনুল...।

আমিনুল দু'হাত ফাঁক করে কৃমির আয়তন দেখায়।

পেন্নাম কর, ডাক্তারবাবুকে পেন্নাম কর...আমিনুলের মা বলে।

আমিনুল প্রণাম করে।

আমিনুলের চোখটা অনেকটা পরিষ্কার।

ডাক্তারের স্বভাবে কমল প্রশ্ন করে, পেচ্ছাপের রং কেমন?

সাদা, জলের মতো।

পাইখানা?

হলদে?

আশেপাশের লোকজন অবাক হয়ে দেখে। এরকম দু-চারটে কেস হলে কমলের সুবিধাই হয়। পসার বাড়ে। খবর চলে যায়। পেশেন্ট বেশি হয়।

কিন্তু কমল ভাবে পৃথিবীটা কী রহস্যময়! কৃমির কোনও ওষুধই দেয়নি কমল। দিয়েছিল চায়না। চায়না-র সঙ্গে কৃমির বেরিয়ে যাওয়া কোনও হোমিওপ্যাথি বইতে লেখা নেই। কিন্তু কৃমি বেরিয়ে

গেছে। রাউন্ডওয়ার্ম ছিল। কৃমি লিভারের ক্ষতি করে। ওই কারণেই জন্ডিসের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। কৃমি বেরিয়ে যাওয়ার পরে জন্ডিসের উপসর্গ কমে গেছে। কিন্তু চায়না প্রয়োগে কৃমি বেরোয়নি। এমনিই বেরিয়ে গেছে। কিন্তু একথা কাউকে বলা যাবে না। ছেলেটা ভালো হয়ে যাওয়াতে কমল তৃপ্তিবোধ করছে ঠিকই, কিন্তু এটা ডাক্তারের তৃপ্তি নয়, ডাক্তারের সন্তুষ্টি নয়। ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ করে ঠিকমতো রোগ ধরে ঠিক ওষুধ দেবার পর রুগিকে ভালো হয়ে যেতে দেখলে যে ভালোলাগা, এ তৃপ্তি সেরকম নয়।

ঝর্ণা না জরিনা, একটা পলিথিন বের করল ব্যাগ থেকে। পলিথিনের ভিতরে কিছু কুঁচো মাছ। বলল, ডাক্তারবাবু, আপনার জন্য এনেছিনু, একদম জ্যান্ত মৌরলা। নে যান। কমল নিতে চায় না। ঝর্ণা আবার বলে, আপনার জন্যই এনেছিলু। কাতর দৃষ্টিতে তাকায় মেয়েটা।

কমলও ভীত চোখে চায়। অন্যরকমের কাতরতা। বলে, আমাদের তো রান্না-বান্না হয়ে গেছে।

ঝর্ণা বলে, ফিরিজে রেখে দেবেন...।

হাতটা বাড়ায় কমল। ঝর্ণার গা থেকে মেছো গন্ধ আসছে। কমল পলিথিনটা নেয়। ঝর্ণা হাসে।

আপনার বাড়িটা কোথায় ডাক্তারবাবু? ঝর্ণা জিজ্ঞাসা করে।

এই তো কাছেই। লালবাবার মন্দিরের পিছন দিকটা। মিত্তিরবাগানের কাছে।

ওখানে একটা নায়েববাড়ি আছে? ঝর্ণা জিগ্যেস করে।

সিনেমায় এ দৃশ্য দেখলে এইসময় কমলের মুখটা নেগেটিভে দেখাত।

কমলের মুখ থেকে তখন ক্র্যাচে ভর দিয়ে একটা বাক্য—ও-বাড়িটার কথা কী করে জানলে?

—মায়ের মুখে শুনেছি যেন মনে হয়।

ও, আচ্ছা। শোনো, এই মাছ নিয়ে যাচ্ছি, তবে এমন আর কোরো না। তোমার ছেলেকে এখনও একমাস তেল-মশলা কম দিও। ভালো থেকো। 'ভালো থেকো' কথাটা বিদায় অর্থে ব্যবহৃত। 'ভালো থেকো' বলা হয়ে যাওয়া মানে আর কোনও কথা নেই। এইভাবে ফুলস্টপ দেওয়ার প্রথাটা আধুনিক। কমল 'ভালো থাকবেন', 'ভালো থাকিস' এসব বলে না। 'এবার আসি'ই বলে সাধারণত। এখন 'ভালো থেকো' বলল স্মার্ট হবার জন্য, নাকি নার্ভাস লাগল বলে?

রিকশায় উঠে যায় কমল।

রাত্তিরে ঘুম আসে না কমলের। কেবল আমিনুল আর আমিনুলের মা ঝর্ণা। ঝর্ণার মায়ের নাম কী? সেজদার মৃত্যুর পর একটা ডাইরি পাওয়া গিয়েছিল। ওখানে কিছু পাওনাদারের নামধাম লেখা ছিল। কিছু মেয়েমানুষের নামও ছিল। একটা নাম মনে আছে কোকিলা। নামটা আনকমন বলেই মনে আছে। লেখা ছিল, কোকিলার অপারেশন খরচ ১২০০ টাকা। কোকিলা নামটা আরও কয়েকবার ছিল ডাইরিতে। আরও দু-চারটে মহিলার নাম ছিল। সেই নামগুলো মনে নেই। ডাইরিটা মেজদা পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাওনাদারদের জন্য কোনও প্রমাণ রাখতে চায়নি। তাছাড়া ওই ডাইরিটা ছিল একটা পারিবারিক কলঙ্ক।

কোকিলা নামটা সাধাণত বাঙালদের ঘরের মেয়েদের হয়। নিজেদের জানাচেনা কারোর মধ্যে কোকিলা নেই। ঝি-টিদের মধ্যে ময়না পাওয়া যায়। কিন্তু কোকিলা পাওয়া যায়নি। বেদে-টেদের মধ্যে কোকিলা হয় বোধহয়। কী একটা গান আছে না, ও কোকিলা তোরে শুধাই রে...। কোকিলার সঙ্গে সেজদার কী সম্পর্ক ছিল ঠিক ঠিক জানা যায় না। একটা অপারেশন খরচ লেগেছিল। সেজদাই দিয়েছিল। কী অপারেশন? অ্যাবরশন? তাতে কি তখন বারোশো লাগত? কোকিলা যদি বাঙালই হবে, তো ঝর্ণার কথার মধ্যে একটু বাঙাল বাঙাল টান থাকা উচিত। কিন্তু ঝর্ণার কথায় তো ওরকম বাঙাল টান নেই। টান থাকতেই হবে? কে বলেছে? কোকিলা যে বাঙাল তাই বা কে বলেছে! আরে, কোকিলাই যে ঝর্ণার মা তাই বা কে বলেছে?

যে দুজন মহিলা চোখ মুছতে মুছতে বউ বলে এসেছিল, ওদের নাম মনে করতে পারছে না কমল। ওরা তো নামধাম বলেছিল। আসলে ওরা মানে কমলরা নাম-ধাম শুনতে চায়নি। শুনলেও মনে রাখতে চায়নি। মানুষ যা মনে রাখতে চায় না, তা ভুলে যায়।

বউ বলে দাবি-করা যে দুজন মহিলা এসেছিল, সেজদার সঙ্গে নিশ্চয়ই তাদের শারীরিক সম্পর্ক ছিল, নইলে নিজেদের স্ত্রী বলে দাবি করতে পারে না। ওরা কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি। রেজিস্ট্রি করেনি সেজদা। ওরা বলেছিল কালীঘাট-টালিঘাট। তাদের একজন কোকিলা তো হতেই পারে। বড্ড কষ্টে কেটেছে নিশ্চয়ই। ঝর্ণা হল কোকিলার মেয়ে। কমল তাহলে ঝর্ণার কাকু হয়। আমিনুলের দাদু।

উঃ...। মাথার চুল ছেঁড়ে কমল। কে বলেছে কোকিলার মেয়ে ঝর্ণা? আর কোকিলার মেয়ে হলেই কি সেজদার সন্তান হবে নাকি? এইসব কোকিলারা তো অনেককে দিয়েই...। একমাত্র ডিএনএ টেস্ট এ-প্রমাণ করতে পারে। কমল আর আমিনুল বা ঝর্ণার ডিএনএ-র মধ্যে নায়েববাড়ি ঠিক রয়ে গেছে। ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডের ভিতরকার ডবল হেলিক্সের নিজস্ব ধর্ম আছে। ওখানে

হিন্দু-মুসলিম নেই। ওদের বংশধারা বহন করছে কিছু রাসায়নিক। ডিএনএ টেস্ট। একমাত্র ডিএনএ টেস্ট।

রুমা ধাক্কা দিল কমলকে। ঘুমের মধ্যে এরকম ডিয়েনে ডিয়েনে বলছ কেন?

১২

একটা প্রবন্ধ পড়ছিল কমল একটা কাগজের কভার স্টোরিতে। জল নিয়ে। জল মানে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা অক্সিজেন পরমাণুর বন্ধন। H2O হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ আছে। ডয়টেরিয়াম। জলের মধ্যে অত্যন্ত সামান্য হলেও ডয়টেরিয়াম অক্সাইড বা D2O থাকে। জল বাষ্প হয় ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। কিন্তু ডয়টেরিয়াম ফুটতে ১০০ ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রা লাগে। তার মানে একশো লিটার জলকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে যদি দশ লিটার করা যায়, সেই জলের মধ্যে ডয়টেরিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ যা থাকবে, ফুটিয়ে এক লিটার করলে আরও বেশি থাকবে। মানে জল যত বেশিক্ষণ ফোটানো হবে, ডয়টেরিয়াম অক্সাইডের অনুপাত বাড়তে থাকবে। জলে ডয়টেরিয়াম অক্সাইড বেশি থাকলে জীবাণু বাড়তে পারে না। এ জন্যই কাসুন্দির জল অনেকক্ষণ ধরে ফোটাতে হয়। বরফ জলের চেয়ে হালকা। তাই জলে বরফ ভাসে। জল জমে যখন বরফ হয়, তখন হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের যে বন্ধন এবং সেইসঙ্গে জলের একটা অণুর সঙ্গে অপর অণুর বন্ধনের জন্য একটু বেশি জায়গা দরকার হয়। তাই আয়তনের বেড়ে যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র একটা গল্প লিখেছিলেন, গল্পের নাম টল। এবং নায়ক ঘনাদা। কোনও বিজ্ঞানী নাকি ‘টল’ আবিষ্কার করেছেন, এবং ওই ‘টল’ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে পৃথিবীটা শেষ করে দেবার চক্রান্ত করছেন। টল সমস্ত জলকেই কাচের মতো শক্ত করে দেবে। ঘনাদা সেই টলের টেস্ট টিউবটা উদ্ধার করলেন। নষ্ট করেছিলেন টল, এবং এর প্রস্তুত প্রণালী, এবং পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন।

জল নিয়ে কত কথা। পড়তে বেশ লাগছে কমলের।

গত শতাব্দীর ষাট এবং সত্তরের দশকে পৃথিবীর নানা দেশে গবেষণা হয়েছিল পলিওয়াটার নিয়ে। মানে জলের পলিমার নিয়ে। ইথিলিনের পলিমার হল পলিথিন। অনেকগুলো ইথিলিন অনু একসঙ্গে মিলে তৈরি করে পলিথিন। জলেরও পলিমার তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে। দুজন রাশিয়ান বিজ্ঞানী, নিকোলাই ফেদিয়াফিন এবং বারিস দেরিয়াগিন দাবি করে ফেললেন যে তাঁরা পলিওয়াটার তৈরি করে ফেলেছেন। আর এই পলিওয়াটার নাকি থকথকে। মাইনাস

ছাপ্পান্ন ডিগ্রিতে বরফ হয়, আর ফোটে দুশো ষাট ডিগ্রিতে। ওঁরা আরও বললেন, সব জলই একদিন পলিওয়াটার হয়ে যাবে। নামীদামি বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিতে পলিওয়াটার বিষয়ে নানা প্রবন্ধ ছাপা হতে লাগল। একদশক ধরে চলল ওই ধুন্ধুমার কাণ্ড। তারপর একদিন বলা হল, পলিওয়াটার ভুয়া। বিজ্ঞানীদের বিভ্রম। জলের কখনও পলিমার হতে পারে না। জলের সেই ক্ষমতাই নেই।

জলের অন্য একটা ক্ষমতার কথা বললেন, ড. জাঁকুই বুভুনেস্কি। একটা প্রবন্ধ ছাপা হল ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের জুন সংখ্যার নেচার পত্রিকায়। যে নেচার পত্রিকাকে বিজ্ঞান গবেষণা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ভাবা হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম—'হিউম্যান ব্যাসোফিল ডিগ্র্যানুলেশন ট্রিগারড বাই ভেরি ডাইলিউটেড অ্যান্টিসেরাম এগেনস্ট আই-জি-ই। ড. বুভুনেস্কি-র সঙ্গে আরও তেরোজন বিজ্ঞানীর নাম যুক্ত রয়েছে ওই গবেষণায়। শিরোনামটা বড়। শুনতে কঠিন। কিন্তু ব্যাপারটায় আছে জলের ম্যাজিক। বিষয়টা এরকম—রক্তের শ্বেতকণিকা বা ব্যাসোফিল রোগ প্রতিরোধে একটা বড় ভূমিকা নেয়। এই ব্যাসোফিল কোষের গায়ে লেগে থাকে ইমিউনোগ্লোবিন ই। যাকে ছোট করে বলে আই-জি-ই। ব্যাসোফিলের গায়ে আই-জি-ই লেগে থাকে দানার মতো। কোটি গুণ বড় করে দেখলে রসকদম্বের মতো দেখতে লাগবে। ব্যাসোফিল কোষের গায়ে লেগে থাকা গুঁড়োকে বলা হচ্ছে গ্র্যানিউল। কোনও বিশেষ প্রোটিন ওই গ্র্যানিউলগুলোকে খসিয়ে ফেলতে পারে। আর অ্যান্টিবডি মাত্রই হল প্রোটিন। ওই প্রোটিনের মাধ্যমে ব্যাসোফিলের গায়ে লেগে থাকা গ্র্যানিউল খসানোকে বলে ডিগ্র্যানিউলেশন। ড. বুভুনেস্কি এরপর বলছেন, অ্যান্টিবডির উপস্থিতি ছাড়াও ডিগ্র্যানিউলেশন হতে পারে। ধরা যাক, সামান্য একটু প্রোটিন অ্যান্টিবডি জলে গুলে ফেলা হল। পাওয়া গেল প্রোটিন দ্রবণ। এবার এই দ্রবণের এক ভাগের সঙ্গে নয় ভাগ জল মেশালে যে দ্রবণ তৈরি হবে, সেটা হবে প্রথমটার তুলনায় দশগুণ পাতলা। এবার এই দ্রবণের একভাগের সঙ্গে ন'ভাগ জল মেশালে তৈরি হল প্রথম দ্রবণের একশো গুণ পাতলা। এইভাবে ক্রমাগত পাতলা দ্রবণ করতে করতে একের পিঠে একশো কুড়িটা শূন্য বসালে যে বিশাল সংখ্যা পাওয়া যায়, তত গুণ পাতলা দ্রবণ তৈরি করা হল। এত পাতলা এই দ্রবণে মূল অ্যান্টিবডির আর অস্তিত্বই নেই। হারিয়ে যাওয়ার কথা। এক লিটার জলে একটি অ্যান্টিবডি অণুরও থাকার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ড. বুভুনেস্কি দেখলেন ওই পাতলা দ্রবণও ব্যাসোফিলের দানা খসাচ্ছে। মানে শুধু জল, যে জলে একসময় ছিল প্রোটিন অ্যান্টিবডি, সেই জলে এখন তার ধূসর স্মৃতিটুকুই আছে। সেই স্মৃতিটুকুই কাজ করে যাচ্ছে। তবে কি জলের স্মৃতিশক্তি আছে?

কমলের শরীরের মধ্যে হাততালি বেজে উঠল। তাহলে আছে, আছে, আছে। হোমিওপ্যাথি তাহলে বুজরুকি নয়। এলাকায় একটা যুক্তিবাদী সমিতি হয়েছে। ওরা পোস্টারে লিখেছে, জ্যোতিষ-তান্ত্রিক-হোমিওপ্যাথ থেকে দূরে থাকুন। বলছে তাবিজ-কবচ-হোমিওপ্যাথি ওষুধ সব এক। ওদের তাহলে জবাব দেবার মতো যুক্তি পাওয়া গেছে। যে প্রোটিন ব্যাসোফিলের গায়ের দানা ঝরিয়েছে, সেই প্রোটিনেরই কোটি কোটি গুণ পাতলা দ্রবণ, মানে একই কাজ করেছে। জলের মধ্যে আছে হাইড্রোজেন বন্ড। সেই বন্ডের মধ্যেই কোনও স্মৃতি লেগে থাকে নিশ্চয়ই। আর্সেনিক দুশো-র বা থুজা এক হাজারের মধ্যে একটাও আর্সেনিক বা থুজার অণু নেই। কিন্তু ওই দ্রবণের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ অ্যালকোহল আশ্রিত। অ্যালকোহলেও OH মূলক আছে। সুতরাং হাইড্রোজেন বন্ডও আছে। লেখাটা শেষ হয়নি। আরও পড়তে থাকে কমল। নেচারের ওই প্রবন্ধটা সাড়া ফেলেছিল সারা পৃথিবীতে। একটা সাংঘাতিক আবিষ্কার।

সত্যিই তো এতবড় একটা আবিষ্কারের কথা কমল জানতই না। কমল কেন, এদিককার তাবড়-তাবড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের কেউ কি জানত? কে-ই বা নেচার পড়েছে? এটা জানতে পারল কমল একজন বিজ্ঞান-সাংবাদিক এটা লিখলেন বলে।

শত্রুর অভাব থাকে না সারা পৃথিবীতে কোনওকালে। নেচার পত্রিকায় প্রতিবাদ আসতে লাগল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। নেচার পত্রিকার সম্পাদক ড. বুভুনেস্কিকে বললেন বিশ্বের কয়েকজন জীবরসায়ন বিজ্ঞানীদের সামনে পরীক্ষাটা করে দেখাতে।

আবার পরীক্ষার পর পরীক্ষা হতে লাগল। তারপর নেচার পত্রিকা ছাপল তদন্ত রিপোর্ট। ওরা বললেন, ড. বুভুনেস্কি-র দাবি ঠিক নয়। আরও পরীক্ষার দরকার। ওরা বললেন, জলের কি তাহলে মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রংশ হয়? ড. বুভুনেস্কি বললেন, আমি প্রমাণ করে দেব আমি ঠিক।

এখনও প্রমাণিত হয়নি।

কিন্তু প্রমাণের অপেক্ষায় বসে আছে কমল। হ্যানিম্যানের পর কতগুলো প্রজন্ম কেটে গেল। কমলের জীবদ্দশায় যদি একটা ব্যাখ্যা মেলে তো নিস্তার পাওয়া যায়। মরে যাবার আগে জেনে যাওয়া যায় হোমিওপ্যাথি প্রতারণা নয়, প্লাসিবো নয়।

বসে আছি হে।

সকালবেলা থেকেই বেশ গরম। রুমা একবার বমি করল। কমল ভাবল, গরমের জন্য। একটু ক্যান্তর খেতে দিল। এরপর শ্বাসকষ্ট। পাশের ঘরে দরজা ধাক্কাতে লাগল কমল। পড়শিরা এল। নার্সিংহোম। অক্সিজেন এবং আইসিইউ। কয়েকটা ইনজেকশন লিখে দিল ডাক্তার। ইনজেকশন নিয়ে ছুটে এল কমল। কমল ও রুমার মাঝখানে একটা বড় কাচের দরজা। কমল কাচের এপাশে বসে আছে। এখন কি রুমার জ্ঞান আছে? ওকে কয়েকটা কথা বলার ছিল। কী কী বলার ছিল? ভাবতে লাগল কমল। প্রথমেই মনে এল ওই প্রবন্ধটার কথা। ড. বুভুনেস্কি। ওই প্রবন্ধটার কথা সহজ করে বলার ইচ্ছে রুমাকে।

ব্যস? এইটুকু?

সাদা পোশাকের নার্স কাচের ওপারে। হাতছানি দিয়ে ডাকল। কমল গেল। কাচের দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সাদা পোশাক বলল, সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। তারপর কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল, কিছু বলা যাচ্ছে না। ডাক্তাররা অ্যাটেন্ড করছেন। দরজার এপাশে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে কমল? পকেটে একটা মোবাইল ফোন আছে কমলের। বেশিদিন নেয়নি। নেবে না ভেবেছিল। কিন্তু শেষ অবধি নিয়েছে মাসখানেক হল। মোবাইলে সড়গড় নয় কমল। কাকে ফোন করবে? প্রথমেই ড. বুভুনেস্কির কথা মনে এল। পাগল? নিজেকেই বলে। আত্মীয়স্বজন—কাউকে বোধহয় ফোন করা উচিত। কিন্তু কিছু উৎসাহ বোধ করল না। আবার দরজার ওপাশে সাদা পোশাক। একটা টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল। ইনজেকশন।

ইনজেকশন নিয়ে ছুটে এল কমল। কাচের দরজার সামনে দাঁড়ানো সাদা পোশাকের নারী বলল, সরি!

১৪

শূন্য ঘর। শূন্য বিছানা। বিছানায় স্মৃতি। শুধু স্মৃতি পড়ে থাকে। কমল ঘুমের ওষুধ খায়। কোনওদিন সকালে উঠে ঘুরতে বেরোয়, কোনওদিন বেরোয় না। ঘরেই থাকে। যে বাসন-টাসন-মাজে, সে-ই সামান্য কিছু রান্না করে দিয়ে যায়।

কমল রুগি দেখে, চেম্বারে যায়, জীবন তেমনই আছে। রুমার ছবি আছে দেওয়ালে।

রুমার কি কিছু বলার ছিল? কী বলার ছিল? ভালো থেকো সাবধানে থেকো শরীরের যত্ন নিও ছাড়া?

কমল আজ গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছে। জল। স্মৃতিময় জল। বাঁ-পাশে ঝুপড়ি। ওখানে জীবন। জীবনের জন্য যুদ্ধ। কমল আর জীবনকে ভোগ করে না তেমন। কিন্তু রুগি ভালো হলে ভালো লাগে

শুধু। এই ভালো হওয়াটা কি সত্যিই ওষুধের গুণে? কীভাবে কাজ করে হোমিওপ্যাথি? ঠিকমতো জানা গেলে বেঁচে থাকার একটা সুখ পাওয়া যেত। জোর দিয়ে বলতে পারত আমি ঠিকমতো ওষুধ চয়ন করেছি, এবং একজন মানুষের অসুখ ভালো করেছি। বিষে বিষক্ষয় জাতীয় তত্ব যথেষ্ট নয়। সেই কবে হিপোক্রাটিস লক্ষ করেছিলেন কিছু ভেষজের মানবদেহের ওপর ক্রিয়ার সঙ্গে কয়েকটা রোগের লক্ষণ মিলে যায়। সুস্থ মানুষকে কাঁচা সিঙ্কোনা খাওয়ালে কম্প দিয়ে জ্বর হয়, আবার হ্যানিম্যান দেখলেন কম্প দেওয়া জ্বরের রুগিকে অল্পমাত্রায় সিঙ্কোনা প্রয়োগ করলে সেই উপসর্গ প্রশমিত হয়। কিন্তু ডাইলিউশন তত্ব? দ্রবণ যত পাতলা হবে—ওষুধের শক্তি তত বেড়ে যাবে? এমনকী এক লিটারে একটাও সেই ভেষজের অণু নেই, অথচ সেটাও ওষুধ। নিরাময়কারী ওষুধ।

ড. বুভুনেস্কি, তোমার পরীক্ষার যেন জয় হয়। ওটা দেখে যাবার জন্যই আমার বাঁচা।

ছিটকে গেল কমল। একটা মোটরবাইক ধাক্কা মেরেছে কমলকে। কমল অন্যমনস্ক ছিল। অন্যমনস্কই থাকে আজকাল। মুখ থুবড়ে পড়ল। হাতটা ছেঁচড়ে গেল। মাথায় হাত দিল। হাতে রক্ত নেই মনে হল। কয়েকজন লোক জড়ো হল। অনেকের মধ্যে ঝর্ণা আর আমিনুলও আছে। ঝর্ণাই যেন হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, আমাদের ডাক্তারবাবু যে। জলের ঝাপটা দিল লোকজন। একটা অটোরিকশাও জোগাড় হয়ে গেল। ঝর্ণা আর আমিনুল বসল দুপাশে। অনেকবার ঝর্ণা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় লেগেছে কাকু।

বাড়িতে উঠিয়ে দিল ওরা। ঝর্ণা বলল, কাকিমা নেই?

কমল ঘাড় নাড়ল। দেওয়ালে রুমার ছবি। কমল একটু আর্ণিকা খেয়ে নিল। ডেটল আর তুলো বার করল। ঝর্ণা হাতের কনুই, চেটো, থুতনিতে লাগিয়ে দিল।

ঝর্ণা বলল, আজ আমি আপনাকে ফেলে কাজে যাব না।

কমল বলল, তোমার কিছু চিন্তা করতে হবে না। কাজের লোক আসবে। কমল ঘড়ি দেখল। ওর আসার সময় পার হয়ে গেছে। কমল অনুভব করল, ওর মাথাটা খুব ব্যথা করছে। কমল শুয়ে পড়ল। মাথার ভিতরে চোট লাগেনি তো? কোনও ইন্টারনাল হেমারেজ? ইতিমধ্যে বাসনের ঝুনঝুন শুনতে পাচ্ছে কমল। ঝর্ণা তাহলে বাসন মাজছে। একটু পর ঝর্ণা এসে বলল, চা খাবেন কাকু?

কমল বলল, করে দাও।

ঝর্ণা সারাদিন ছিল। তারপর দিন সকালে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় এল না। কমল চেম্বারে না গিয়ে গঙ্গার ধারের ঝুপড়ির দিকে গেল। ঝর্ণার খোঁজ করল। শুনল, ঝর্ণা একটা বাজে মেয়েছেলে। একজন পুরুষমানুষের সঙ্গে ফস্টিনস্টি আছে। ওর সঙ্গে কোথাও ভেগে গেছে।

বাড়ি ফিরল কমল। বাড়িতে আমিনুল। মাথার ব্যথাটা আর নেই। তবে কি আর্ণিকাতেই কাজ হল?

কমল বলল, তোর মা যদি না ফেরে?

আমিনুল বলল, তোমার কাছেই থাকব। আমাকে রাখবে?

তোর মা কোথায় যেতে পারে বল তো?

আমিনুল শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ঝর্ণা ফিরবে কিনা কমল জানে না। আমিনুল কে, কমল জানে না। হতে পারে ওই আমিনুলই সেজদার স্মৃতি। আমিনুলকে স্নান করিয়েছে। সাবান মাখিয়েছে। ডাল ভাত ডিম আলুসিদ্ধ দিয়ে ভাত খাইয়েছে। আলাদা বিছানা নয়, নিজের বিছানাতেই শোয়াল কমল।

ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। পাশের খোলা জায়গায় বড় বাড়িটা ওঠার আগে চাঁদের ফালি এসে বিছানায় এমনই ঘুমোত।

এখনও ঘুমোচ্ছে। আমিনুল। চাঁদের স্মৃতি। চাঁদ নেই। স্মৃতি আছে। জলের ভিতরকার অন্তর্গত স্মৃতির মতো। ওষুধের ভিতরে থাকা অজানা ওষুধের মতো। না-ই বা জানল ওর পিতৃপরিচয়।

অ্যালোপ্যাথ

পিতৃঋণ

মাসচটক বাড়িটার আর সেই চটক নেই। এখানে-ওখানে পলেস্তরা খসে ইট বেরিয়ে গেছে। শেওলা জমেছে কোথাও কোথাও, বাড়ির পশ্চিমদিকটায় একটা অশ্বত্থগাছ গজিয়ে গেছে। সিংহটার লেজ খসে গেছে, সিংহর হাঁ-মুখের ভিতরে কাকের বাসা। একটা পরির একটা ডানা ভেঙেছে, অন্য পরিটার হাত ভেঙেছে। কার্নিশ খসেছে কোথাও কোথাও। বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখছেন ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় মাসচটক। এই বাড়ির একজন বড় অংশীদার। মৃত্যুঞ্জয়ের ঠাকুরদা ছিলেন জমিদারের নায়েব। তাঁরই

তৈরি করা এই বাড়ি। এই বাড়িতে এখন এক খুড়তুতো ভাই থাকে, আর এক পিসি। এক খুড়তুতো ভাই কাছাকাছি একটা স্কুলের মাস্টারমশাই। অন্য এক খুড়তুতো ভাই রেলের চাকরি করে। বহুদিন বাইরে ছিল, এখন গড়িয়ার দিকে কোথাও ফ্ল্যাট নিয়েছে।

বাড়ির চারদিকে জঙ্গল। একপাটি হাওয়াই চটি পড়ে আছে উলটে, মাটির ভাঙা হাঁড়ি—কে জানে কবেকার, পলিথিন মোড়কে জয়গুরু বস্ত্রালয় আর থার্টি পার্সেন্ট একট্রা বোর্নভিটার প্যাকেট। বাড়ির চারপাশটাই পরিষ্কার করানো হয় না, তো বাড়ির সংস্কার। ওরা এখানে থাকে কী করে? একটু পরিষ্কার করাতে কত খরচ? একটা মুনিষের একদিনের রোজ। একুটুও খরচা করবে না ওরা? বছর তিনেক আগেই তো ফেটে যাওয়া তিনটে থামের পাশে নতুন কংক্রিটের পিলার করে দিয়েছেন। হাজার সাতেক টাকা বেরিয়ে গেছে। এই বাড়িটা তো মৃত্যুঞ্জয় মাসচটকের একার নয়, তবু কেন খরচ করতে যাবেন। পিলারটুকু না করলে বাড়ি ধসে যেত, তাই ওটুকু করেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের কী দায় পড়েছে পরির পিঠে নতুন ডানা বসানোর? সিংহের লেজ নিয়ে কেন ভাবতে যাবেন? তবে বাড়ির গায়ের গাছগুলো উপড়ে ফেলা দরকার, নইলে বাড়িটার ক্ষতি করে দেবে। তাঁর অংশের দেয়ালের অশ্বত্থগাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে। যেখানে পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়েছে, ওখানে একটু সিমেন্ট-বালির কাজ করানো দরকার। নিজের অংশটুকু করে নিতেই পারেন, কিন্তু বাড়ি মানুষের বডির মতোই অনেকটা। পেটে গ্যাস-অম্বল তো মাথা টনটন, মাথা টনটন তো ঘুম হল না, ঘুম হল না তো প্রেসার বাড়ল। বাড়ির ওধারের দেওয়াল হেলে গেলে কি এধারের দেওয়াল ঠিক থাকবে? চকাই-বকাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। চকাই-বকাই ওদের খুড়তুতো ভাই। বকাই তো নেই, চকাই আছে।

দিন পনেরোর জন্য চেম্বার বন্ধ করে দেশের বাড়িতে। সামনেই ওঁর পিতা ঈশ্বর ব্রজবিহারী মাসচটকের জন্মশতবর্ষ। এই গ্রামেই একটা বড় করে অনুষ্ঠান করবেন। সিডিএমও-কে আসতে বলেছেন। বিডিও, পঞ্চায়েত প্রধান এঁরা তো অবশ্যই থাকবেন। চকাই তো আবার পঞ্চায়েতের মাতব্বর। মেম্বার। ওরই নাকি প্রধান হওয়ার কথা ছিল। কেউ কাঠি করে হতে দেয়নি। কী করে এত সময় বের করে ওরা কে জানে! স্কুলের মাস্টারি, তার ওপর টিউশনি, তার ওপর আবার গ্রামের মাতব্বরি। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, এত টাইম কোত্থেকে পাস রে চকাই? ও বলেছিল, টাইম হল রবার জীবুদা। টানলে বাড়ে। টানতে জানতে হয়। তুমি কী করে টাইম পাও? তিনটে চেম্বার, তার ওপর কোন নার্সিং হোমে যাও।

মৃত্যুঞ্জয়ের ডাকনাম জীবু। এ নিয়ে বেশ একটা কাহিনি আছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা সদব্রাহ্মণ। সন্ধে-আহ্নিক করতেন, আসলে মাসচটকরা হলেন অনেক পুরোনো বামুন। বটব্যাল, চম্পটি, বিশি এঁরাও তাই। চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যেরা তো উড়ে এসে জুড়ে বসা। মাসদহ নামে একটা জায়গা আছে নদীয়ায়, মাসচটকরা সেখান থেকেই এসেছে।

তো, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপ্রাশনের আগে জ্যোতিষীকে দিয়ে কোষ্ঠী তৈরি করিয়েছিলেন ব্রজবিহারী। গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে 'খ' কিংবা 'ম' আদ্যক্ষরে নাম রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। 'খ' দিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে 'খগেন'। এছাড়া খল, খটাশ, খড়গ, খঞ্জ, খ্যাঁদা এইসব মনে হল। খচ্চরও। 'খ' বাদ দিয়ে তাই 'ম' দিয়েই নাম রাখা হল। মৃত্যুঞ্জয় নামটার বেশ ভালো মানে। মৃত্যুকে জয় করে যে। ওটাই রাখা হল। কিন্তু ওকে আদর করার সময় ঝামেলার এক শেষ। আদর করার সময় পুরো নামটা কেউ বলে নাকি? মৃত্যুঞ্জয় নামটা ছোট করে বললে ভারী মুশকিল। মৃত্যু মৃত্যু বলে শিশুকে আদর করা যায় নাকি? এসো এসো সোনা আমার মৃত্যু। মৃত্যু আমার কোলে এসো...অসহ্য। তাই মিতু বলা চলছিল। কিন্তু মিতুর মধ্যে মৃত্যুর স্মৃতিটা তো রয়েই গেল। ওর মা বলেছিল, না, ওকে মিতুও ডাকতে পারব না। অবশেষে চিন্তাভাবনা করে ঠিক হল ওকে জীবন নামেই ডাকা হবে।

ডাকনামে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব নেই, তাই ডাকনাম যে-কোনও অক্ষর দিয়েই হতে পারে। তাই মৃত্যুর একেবারে বিপরীত নাম জীবন। জীবন থেকেই জীবু। কিন্তু মন্ত্র পড়ে, অগ্নিসাক্ষী রেখে যে নামটি রাখা হয়েছিল, সেই নামটাই তো ভগবানের খাতায় রেজিস্ট্রি হয়েছে, তাই সেই নামটাই স্কুলের নাম, সার্টিফিকেটের নাম। ডাক্তারি সার্টিফিকেটেও এই নামটাই। সুতরাং এই মানুষটা জীবন ও মৃত্যু দুটোই ধরে আছে। কিন্তু মৃত্যু নামেই তো বেশি খ্যাতি হয়ে গেল। চেম্বারের গায়ে বড় বড় করে ডা. মৃত্যুঞ্জয় মাসচটক লেখা থাকলেও মৃত্যু ডাক্তার বলেই মানুষ জানে। কোনও রিকশাওয়ালাকে যদি বলা হয়—ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় মাসচটকের চেম্বারে নিয়ে চলো, হাঁ করে থাকবে। মৃত্যু ডাক্তার বললে ঠিক আছে। মৃত্যু ডাক্তার নামে বিখ্যাত হলে কী হবে, পশার তো ভালোই। এই যে পনেরোটা দিন দেশের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে, তাতে কি কম লস নাকি? তিনটে চেম্বারে এবেলা-ওবেলায় গড়ে প্রতিদিন একশো রুগি। কিছুদিন হল একশো টাকা থেকে ফি বাড়িয়ে দেড়শো করেছেন। তার মানে পনেরো হাজার টাকা এক দিনে। এর মধ্যে কিছু খাতিরের রুগি আছে, যারা এখনও একশো টাকা দেয়। কিন্তু আসে শুধু রিপোর্ট দেখাতে, তখন ফি নেওয়া যায় না, ওসব ধরলেও বারো হাজার তো মিনিয়াম। পনেরো দিনে দুটো রবিবার বাদ গেল। তেরো দিন। বারো হাজার ইনটু তেরো। ক্যালকুলেটারে এল এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার। দেড় লাখই ধরা যাক। ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট, এসব করিয়ে প্যাথলজি

সেন্টার থেকে পনেরো দিনে পাঁচ হাজার টাকা, এক্স-রে থেকেও মন্দ না, আলট্রাসনোগ্রাফি, সি.টি. স্ক্যান করাতে পারলে ভালো আমদানি। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়েও দিনে শ-দুই টাকা আসে। এছাড়া চেম্বারটা একটু মফস্সলের দিকে। এখানে বসবাসকারী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা শহরের ডিসপেনসারির সুবিধা পায় না। তাই সরকার কিছু ডাক্তারকে প্যানেলভুক্ত করে দিয়েছে। ডাক্তার মাসচটক সেই প্যানেলের ডাক্তার। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা দেখায়, মেডিকেল বিল থেকে দশ পার্সেন্ট। কর্মচারীরা বলেন, একটু বেশি করেই খরচাটা দেখিয়ে দিন। ডাক্তারবাবু সেই অনুরোধটুকু রাখেন। কেউ কেউ আবার পুরোটাই ভুয়ো বিল করতে অনুরোধ করেন। ছোট করে এটাকে বলা হয় এফ.এম.বি.। আরও ছোট করে বা আদর করে এফ.এম.। মানে 'ফলস মেডিকেল বিল'। একটা এফ.এম. করব বললেই ডাক্তারবাবুরা বুঝে যান।

এফ.এম-এর বাজার চলতি রেট হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট। কিন্তু উনি ফর্টি পার্সেন্টই নিয়ে থাকেন। মানে, এক হাজার টাকার এফ.এম. হলে উনি নেবেন চারশো টাকা। ওষুধ দেবেন না, কিন্তু ক্যাশমেমো হয়ে যাবে। ওষুধের দোকানের সঙ্গে সেটিং আছে। ডাক্তার নিজের কমিশন থেকেই ওটা দিয়ে থাকেন। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে ডাক্তাররা ওষুধের দোকানকে দেন, নইলে উলটোটাই হয়। দুটো-একটা করে এফ.এম. কেস রোজই হয়। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আজকাল নাকি খুব ভালো মাইনেপত্র হয়েছে। এর পরেও ওরা এমন করে কেন? অবশ্য সবাই তা করে না, কয়েকজনই ঘুরে ফিরে আসে। প্রশ্নটা মনে হতেই মনে মনে জিভ কেটে ফেলেন মাসচটক। মনে হল—'আমিও তো কম রোজগার করি না, তাহলে আমিই বা এটা করি কেন?'। ফিক করে হেসে ফেলেন মাসচটক। ও কিছু নয়। এদিকের সবাই তো করে। সব প্যাথলজি সেন্টারই তো কমিশন দেয়। ওষুধের দোকানগুলোও তো এফ.সি. করে। মানে ফলস ক্যাশমেমো আর কি। ওষুধ দিতে হয় না, শুধু ক্যাশমেমো দেয়, বদলে কমিশন খায়। অথচ প্রায় সব ওষুধের দোকানেই দেব-দেবীর ছবি থাকে। কেউ-বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ছবি রেখেও এসব করে। ও কিছু না। যে হিসেবটা হচ্ছিল, পনেরো দিনে প্রায় লাখ দুয়েক টাকা লস।

তা হোক লস। বাবার জন্য তো করতেই হবে। বাবা যদি ডাক্তারি না পড়াতেন, তাহলে কি ডাক্তার হওয়া হত? পিতার কাছে তো ঋণী। চিরঋণী। বাড়িতে তো দেয়ালে টাঙানোই আছে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপঃ/ পিতরি প্রিতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা।' ফটো বাঁধাইয়ে দোকানে রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায়।

বাবার মৃত্যুর সময়ে বাবার শয্যার পাশে ছিলেন না মৃত্যুঞ্জয়। বাবাকে শেষ জলটুকু দিতে পারেননি। তবে মুখাগ্নি করেছিলেন। ভুগছিলেন বৃদ্ধ বয়সের রোগে। এদিকে আর জেরিয়াট্রিসিয়ান কোথায়? ওঁর বন্ধু শিবুই চিকিৎসা করছিল। শিবু মানে শিবনাথ যশ। এদিকে ও হল আদি ডাক্তার। তখন তো মোবাইল ফোন হয়নি, এদিকে সবে টেলিফোন লাইন বসেছে। টেলিফোনেই শিবুকে নির্দেশ দিত মৃত্যুঞ্জয়। ব্লাডসুগারটা ঠিক থাকছিল না। খুব বাড়া-কমা হচ্ছিল। ওষুধের ডোজটাও ঠিক করা যাচ্ছিল না। হঠাৎ হাইপোগ্লোইসিমিয়া হয়ে গেল। অজ্ঞান। শিবু ওর মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি পৌঁছে একটু নুন-চিনির জল খাওয়াতে গেল চামচ দিয়ে, কিন্তু জলটা গড়িয়ে পড়ল। মানে, ইতিমধ্যেই হুট করে একটা মেজর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে।

খবর পেয়েই গাড়ি নিয়েই পৌঁছে গিয়েছিলেন মৃতুঞ্জয়, সপরিবারে। সেই শ্মশান। যেখানে ওঁর ঠাকুরদা কিংবা ঠাকুরদার বাবার দেহ দাহ হয়েছে, ওখানেই বাবাকে রাখলেন।

এবার ওখানে একটা সমাধিফলক করে দিতে হবে। শ্বেতপাথরের।

বাবার আলমারি খোলা হয়েছিল পরের দিন। দলিল-দস্তাবেজ, ব্যাঙ্কের পাশবুক। পাশবুকে হাজার বিশেক মতো। বাকিটা ফিক্সড। মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গেই তো জয়েন্ট। একমাত্র সন্তান। একটা ডায়েরি পেলেন। নীল মলাট। ডায়েরিতে বেশ কিছু কবিতা। ব্রজবিহারীর একটু সাহিত্যপ্রীতি ছিল। বাড়ির কাচের আলমারিতে বাবার বেশ কিছু বই আছে। বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন, ভূমি সংস্কার আইনের রূপরেখা, সহজ দলিল লিখন শিক্ষা, ইজি লেটার রাইটিং, ইংরেজিতে কথা বলা শিক্ষা, শ্রীকান্ত, বিন্দুর ছেলে, বিষবৃক্ষ, কবিতা কুসুমাঞ্জলি, ছড়া ও কবিতায় হোমিওপ্যাথি শিক্ষা...এরকম কত বই। কবিতার খাতাটা খুলেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। অনেক কবিতা। প্রায় ৭০-৮০টা কবিতা লিখেছেন। বাবার যে এই রোগটা ছিল মৃত্যুঞ্জয় তা বোঝেননি কখনও। ছি ছি ছি, রোগ বলতে নেই। রোগ কেন হবে। লোকে বলে বটে কাব্যরোগ, কিন্তু ওটা রোগ নয়।

কবিতাগুলি পড়ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়—

সেগুনের বহু গুণ

দাম বাড়ে বহুগুণ

শ' খানেক সেগুন পুঁতে

সন্তান রাখ দুধেভাতে।

সত্যিই তো এক বিঘা ভাঙা জমিতে বাবা সেগুন পুঁতেছেন বিশ বছর আগে। হতে পারে শ-খানেক গাছ আছে, গোনা হয়নি। এখন প্রতিটি সেগুন গাছের দাম এক লক্ষ টাকার উপর।

একটা কবিতা—সর্বশিক্ষা।

সবার জন্য শিক্ষা চাই উঠিয়াছে রব।
নেতা মন্ত্রী জড়ো হয়ে করে মহোৎসব।
ডোম মুচির ছেলেপিলে ইস্কুলেতে যাবে,
বছর কয়েক পরেই সবাই টেরটি কেমন পাবে।
মাঠের ধান মাঠেই রবে গোলাতে আসবে না।
কি করে আনিবে বল লেবার তো পাবে না।

সত্যিই, বাবার ছন্দজ্ঞান কী সুন্দর। একেবারে তালে তালে। এবার বোঝা গেল, নিজেরও মাঝে মাঝে কবিতা কেন পায়। পুরীতে গিয়ে মনে হয়েছিল—হে সমুদ্র! তুমি কি শুধুই স্যালাইনের জল? / নাকি তোমায় আশ্রয় করে শত মৎস্য দল?—এরকম আর কি। লেখা হয়ে ওঠে না। একবার এক নৃত্যশিল্পীর পায়ের এক্স-রে দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল—

তুমি কি শুধুই অস্থি? পাটেলা, টিবিয়া?
শত ছন্দে নৃত্য কর এই অস্থি দিয়া।
অস্থির উপরে মাসল, চর্ম আচ্ছাদন
কি সুন্দর শোভা মোরা করি আস্বাদন।
অথচ এই পায়ে ধরে আর্থারাইটিস...

এরপর আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যাক গে। বাবার কবিতা লেখা ডায়রি নিয়ে কথা হচ্ছিল। ডায়েরিতে পরলোকগতা মায়ের জন্য শোক-উচ্ছ্বাস আছে। বাবার মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে মাতৃবিয়োগ হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ের। বাবার চেয়ে মায়ের বয়েস পনেরো বছর কম ছিল। তার মানে মায়ের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের এখনও পনেরো বছর বাকি। এই পনেরো বছরে নিজেই একটা নার্সিং হোম করে নিতে পারবেন। নার্সিং হোমটা ওঁর মায়ের নামেই রাখবেন বলে ভেবেছেন—বিন্দুবাসিনী আরোগ্য নিকেতন। ডায়েরিতে মেঘ, প্রজাপতি, বর্ষা, এরকম কিছু কবিতা দেখা গেল। এইগুলো হল প্রকৃতি পর্যায়। বর্ষা কবিতায় আছে—

যখন তখন নামো বৃষ্টি

আমাদের কর অনাসৃষ্টি
সবে স্প্রে করিলাম ধানগাছে কীটনাশ
জলে ধুয়ে হয়ে গেল কী যে সর্বনাশ
তবুও তোমারে পূজি হে যৌবনবতী
তুমি না আসিলে হ'ত চাষিদের ক্ষতি।

এরকম পড়তে পড়তে পড়তে একটা কবিতায় এসে চোখ আটকে গেল মৃত্যুঞ্জয়ের।

সাত বর্ষ ধরি
বহু ব্যয় করি
পুত্ররে করিনু ডাক্তার
তারই হবে গাড়ি
তারই হবে বাড়ি
শত লোকে জানিবে নাম তার
(আমি) রাখিব এ দেহ
জানিবে না কেহ
কী বা মোর ছিল অবদান
আমি ভাবি মনে মনে
ওর ডাক্তারির পিছনে
রয়েছে ক'হাজার বস্তা ধান
(যদি) ডাক্তারি না পড়িত
(মোর) জমি বেড়ে যেত
কিংবা করিতাম চাল কল
(তাই) গীতা কাছে আনি
মনে স্মরি বাণী
কর্ম কর, নাহি চাহ ফল।

এই কবিতাটাই বলা হয় মৃত্যুঞ্জয়ের আই ওপেনার। এটা পড়েই বোধোদয় হল—বাবা কতটা ত্যাগ করে, ক'হাজার বস্তা ধানের বিনিময়ে ডাক্তারি পড়িয়েছেন। সম্পত্তি একটা মোহ। সম্পত্তি একটা আত্মতৃপ্তি।

নিজের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স দেখতে, দলিলে নিজের নাম দেখতে কার না ভালো লাগে। একটা চালকল করা মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে যাওয়া। ওর ডাক্তারি পড়ার জন্যই তো বাবার শখটা মিটল না। কেবল জোতদার হয়েই রইলেন।

জোতদার একটা গালাগাল। আগে জমিদার, জোতদার, তালুকদার, এসব ছিল অহংকারের ব্যাপার। জোতদার-তালুকদাররা আলাদা খাতির পেত। যদিও মেডিকেল কলেজে হোস্টেলে শুনতে হয়েছে শালা, জোতদারের বাচ্চা। অথচ কৌটোয় ভরা মায়ের দেওয়া তিলের নাড়ু, নারকোল নাড়ু সব্বাইকে খাইয়েছে মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঠাকুর্দা নায়েবি করতেন। নায়েবির সঙ্গে জমিদারবাড়ির পুজো-আচ্চার ভারও ওঁর ওপর ছিল। মানে, উনি নিজে বসে পুজো করতেন না, তবে সুপারভাইজারি করতেন। এটা করো-ওটা করো করতেন। নতুন জমি কেনার আগে শুভদিন দেখে দেওয়া, জমিদারকন্যার শ্বশুরবাড়ির লোকজন যেন কন্যার তাঁবে থাকে সেজন্য উপযুক্ত তন্ত্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা, এরকম নানা কাজ করতে হত। তাই জমিদার প্রসন্ন হয়ে কিছু জমি দান করেছিলেন। সেসময়ে সেটা নিষ্কর জমি ছিল। আসলে, মৃত্যুঞ্জয়ের পিতামহ ছিলেন ব্রাহ্মণ নায়েব।

স্বাধীনতার পাঁচ-সাত বছর পরই জমিদারি উচ্ছেদ হয়ে গেল। নায়েবি-টায়েবি চলে গেল। জমির আয়তন সব মিলে কম ছিল না। কিন্তু ল্যান্ডসিলিং অ্যাক্ট এসে গেল। জমির একটা ঊর্ধ্বসীমা করে দিল। তিপ্পান্ন নাকি চুয়ান্ন বিঘের বেশি কেউ জমি রাখতে পারবে না। বাড়তি জমি সরকার নিয়ে নিল। যে জমিটা ছিল সেটা বাবা-কাকার মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। এ-নামে—সে-নামে কিছু জমি ছিল, বামফ্রন্টের টাইমে তা-ও গেল। জমিজমার বেশিরভাগই ছিল বর্গায়। বর্গাদাররা জমি চাষ করে ভাগ দিত। একটু তেড়িবেড়ি করলে বর্গাদারদের সরিয়ে দেওয়া যেত। বর্গা রেকর্ডিং হয়ে যাবার পর বর্গাদারদের পোয়াবারো হয়ে গেল। ভাগ দিক, না-ই দিক, আর কিছু বলা যাবে না। কে আর জে.এল.আর.ওর কাছে নালিশ করতে যাচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পর জমিজমার ব্যাপারটা খুড়তুতো ভাইরাই দেখেছে। ওরা যা দেয়, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়কে। কিন্তু বাবার ধ্যান-জ্ঞান ছিল জমি। মুনিষ, মাইন্দর, মজুররা চাষ করত, বাবা কোলে রেডিয়োটা নিয়ে চাষ দেখতেন, আলে আলে ঘুরতেন, বাড়িতে আগে বড় গোলা ছিল, পরে একটা ধানের ঘর হয়। ধান যা হয় বেচে দেওয়া হত। এই ধানের চাল মোটা, সরু চাল বাজার থেকে কেনা হত। সাধারণভাবে থাকতেন তিনি। একটিমাত্র সিল্কের পাঞ্জাবি ছিল। অনেক বলে-টলে বাড়িতে একটা ফ্রিজ কেনানো গেল। বাবা-মা

বলতেন ফ্রিজের খাবারে ভিটামিন নষ্ট হয়। ভিটামিন নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে। ডাক্তারের বাবা হয়েও ব্রজবিহারী ব্যতিক্রমী ছিলেন না।

বাবার কবিতাটা পড়ে মৃত্যুঞ্জয় বাবার দুঃখটা টের পান এবং এরপরই ভাবেন বাবার জন্য কিছু করতে হবে।

কিন্তু স্বর্গত পিতার জন্য এখন স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া আর কী-ই বা করা যায়। এতদিন সময় হয়ে ওঠেনি। সামনেই জন্মশতবর্ষ। তাই কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। যথা—(১) শ্মশানে একটা সমাধিফলক নির্মাণ, (২) ঝাপানডাঙা বিদ্যাসুন্দর বিদ্যালয়ে বছরের শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে দেবার জন্য বাবার নামে একটা পুরস্কার চালু করা, (৩) নিজের বাড়িতেই বাবার নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করা (৪) জন্মশতবার্ষিকীতে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। গ্রামোন্নতিতে ৺ব্রজবিহারী মাসচটকের অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন পঞ্চায়েতের কেউ। মৃত্যুঞ্জয় বলবেন দরদী মানুষ ব্রজবিহারী। শেষে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সমাধিফলকে কী লেখা থাকবে সেটা লেখা হয়ে গেছে—

দাঁড়াও ক্ষণকাল জন্ম যদি তব এই গ্রামে,
এখানে পঞ্চভূতে বিলীন ব্রজবিহারী নামে
মাসচটক বংশীয় ব্রাহ্মণ। গ্রামের অধিবাসীগণ
কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁরে করিছে স্মরণ।

নিজেই লিখেছেন মৃত্যুঞ্জয়। বোঝাই যাচ্ছে কিছুটা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছিল।

ঝাপানডাঙা স্কুলটা এদিকের প্রাচীন স্কুল। গুড়াপ-এর জমিদারের বদান্যতায় স্কুলটা হয়েছিল। ঠাকুরদা গুড়াপের জমিদারেরই নায়েব ছিলেন।

জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটা নিয়ে ভাবতে হবে। পঞ্চায়েতের প্রধানকে বলে দিতে হবে কী কী করতে হবে। ওঁর জন্য একটা শাল কিনতে হবে। বর্ধমান থেকে কিনে আনলেই চলবে। শালির মেয়েটাকে আনা করাতে হবে। রেডিয়োতে অডিশনে ফেল করেছে বলে মন খারাপ। ফাংশানে গাইতে পারলে খুশি হবে। ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে। অন্যান্য আইটেম লোকাল ট্যালেন্ট দিয়ে হয়ে যাবে।

আর দাতব্য চিকিৎসালয়টা নিয়েই যা ঝামেলা। ওটাই প্ল্যান করে করতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয় এখন বাড়ি পরিক্রমা সেরে দোতলায় ওঁর ঘরের জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে। লোহার শিকের গায়ে নিজের গালটি লাগিয়ে লোহার শীতলতার স্বাদ নেন। লোহার শিকের গায়ে কী সুন্দর একটা গন্ধ!

যেন ছেলেবেলার গন্ধ। শিকের গায়ে পাখির বিষ্ঠা শুকিয়ে আছে। কী পাখির? শালিক? কাক। টিয়াও তো হতে পারে। ছোটবেলায় অনেক টিয়া দেখা যেত। এবারও দু-চারটে দেখা গেছে। সামনের সজনেগাছে একজোড়া পাখি। চেনা, নাম মনে পড়ছে না। দুটো মুনিষ বাইরের উঠোনে বসে বাসি তরকারি দিয়ে জলভাত খেয়ে নিচ্ছে। দেওয়ালে পেণ্ডুলামের ঘড়িটায় ন'টা বাজার ঘণ্টা বাজতে শুরু করে দিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় এই সময়ে বেলঘরিয়ার চেম্বারে বসে যান। সকাল আটটার আগেই টয়লেটে ঢুকে যেতে হয়। খুব কায়দার বাথরুম। একটা বাথটব আছে। ব্যবহার হয় না। গরম-ঠান্ডা জল, বেসিনটপ, ড্রাই ফ্লাওয়ার। টলিফোন শাওয়ারটা ঘাড়ে গর্দানে বাহুসন্ধি-উরুসন্ধিতে ঘোরাতে ঘোরাতে বাবার শোখানো স্নানমন্ত্রটা পড়ে নেন—ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গাং প্রভাস পুষ্করাণি চ তীর্থন্যেতানি পুণ্যানি স্নান কালে ভবন্তি হ। আগে পুকুরে স্নান করার সময় পড়তে হত। ওই যে পুকুরটা। পানায় ভরেছে। শাপলাও আছে। স্নানটা সেরে, জানলার দিকে তাকিয়ে ফট করে সূর্যপ্রণামটা সেরে নেন মৃত্যুঞ্জয়। স্নান সেরে কালী, বাবা-মার ছবিতে মালা দেন, ড্রেস করেন, ব্রেকফাস্ট করেন, এবং বেলঘরিয়ার চেম্বার। বাড়ি ফিরতে আড়াইটে-তিনটে বেজে যায়। বাড়িতে সন্ধের পর বসেন রোজই।

লুচির ভাজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঘিয়ের। ব্রেকফাস্ট তৈরি হচ্ছে। সরি, ব্রেকফাস্ট নয়, জলখাবার। দেশের বাড়িতে জলখাবারই তো।

ঘোলায় বাড়িটা করার আগে বেলঘরিয়াতে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন মৃত্যুঞ্জয়। হাউসস্টাফশিপের পর বেলঘরিয়া জুট মিলের ডিসপেনসারিতে চাকরি হল। সকালে চাকরি, বিকেলে প্র্যাকটিস। এরপর এদিকেরই বাসিন্দা হয়ে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়। কলকাতার কাছাকাছি ফ্ল্যাট কিনতেই পারতেন, কিন্তু এদিকের প্র্যাকটিস ক্রমশ জমে উঠেছে। ঘোলার দিকে একটা বারো কাঠা জমির প্লট পেয়ে গেলেন। কয়েকটা আম-কাঁঠাল-নারকেলগাছ সমেত। গ্রামের ছেলে। খুপরি ফ্ল্যাটে মন ওঠে না। ওখানেই মনের মতো বাড়ি। দোতলায় দু-পাশে দুটো বারান্দা। বারান্দা নয়, ব্যালকনি। একতলায় ড্রাইভার এবং সারভেন্ট এবং গ্যারেজ। দোতলায় চারটে বেডরুম, এছাড়া ঠাকুরঘর, ডাইনিং, লিভিং।

শ্যালো পাম্পের ডিগ ডিগ ডিগ শুরু হল। এই শব্দটা এখনও নতুন লাগে। ছোটবেলায় এই শব্দটা ছিল না। পিঠে সিলিন্ডার বেঁধে হাতে পাইপ নিয়ে দুজন লুঙ্গি-পরা মুনিষ। পোকা মারার ওষুধ ছড়াবে। এই দৃশ্যটাও ছোটবেলায় ছিল না। একটা মাছরাঙা পাখি ছুঁয়ে গেল জল, জল কেঁপে উঠল। বহু পুরোনো ছবি, পুরোনো হয় না। কাঁঠালগাছটার গা বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি উঠছে। কাঠবিড়ালি চিরকাল ব্যস্তই থেকে গেল। নারকেলগাছের মাথায় একটা ঘুড়ি আটকে বাতাসে কাঁপছে। ডাক্তারবাবু ছবি দেখছেন।

কিন্তু ছবি দেখলে চলবে কেন? কত কাজ বাকি। জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চেয়ার-টেবিল অর্ডার দিতে হবে। বাড়িটায় চুনকাম। বিকেলে ডাক্তারের ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলতে হবে। দাতব্য চিকিৎসালয় হচ্ছে, অথচ ডাক্তারই ঠিক হল না এখনও...।

ঝাপানডাঙায় ওদের বাড়ি থেকে গুড়াপ প্রায় তিন কিলোমিটার। এখানেই ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। হালে একটা নার্সিংহোম হয়েছে এখানে। মা তারা নার্সিং হোম। দুটো ওষুধের দোকান, ওখানে ডাক্তার বসে। এখন বহুত নতুন কথার আমদানি। রুগিকে বলে পেশেন্ট। পথ্যকে বলে ডায়েট। গর্ভপাতকে এম.টি.পি। গুড়াপে একটা বহুদিনের পুরোনো হাট আছে। মঙ্গল-শুক্র হাটবার। আগে হাটবার ছাড়া অন্য দিন বাজার বসত না। আজকাল রোজই বাজার বসে। গুড়াপ অঞ্চলের কলা বেশ বিখ্যাত। এটা হুগলি জেলার শেষ, একটু পরই বর্ধমান জেলা শুরু। হাটবারে কলা পাইকারি বেচা-কেনা হয়। এই হাটেই মৃত্যুঞ্জয়ের ছোটবেলার বন্ধু তারক গড়াইয়ের চেম্বার। ওর চেম্বারের ওপর বেশ বড় বোর্ড, ওখানে রেডক্রস, তারপর ওর নাম। ডা. টি.কে. গড়াই। আর.এম.পি। ডানদিকে একটা স্টেথোস্কোপের ছবি। এই ছবিটা দেখলে হঠাৎ কুণ্ডলি হয়ে থাকা সাপ ভাবা অস্বাভাবিক নয়।

মৃত্যুঞ্জয়কে দেখেই তারক ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।—'আরে আরে তুই? আয় আয় আয়। কী সৌভাগ্য।' ডাক্তারের পিছনে নাড়িভুঁড়ির ছবি। তলায় ইংরেজিতে লেখা—ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। একজন রুগি, রুগি তো নয়, পেশেন্ট টুলের ওপর জিভ বের করে বসে আছে। তারক ডাক্তার বললেন—জিভ এবার জিভের জায়গায় যাক। অন্য রুগিদের দিকে তাকিয়ে বললেন—চিনঅ? চিনঅ ইনাকে? ঝাপানডাঙার জীবন ডাক্তার। মস্ত ডাক্তার। কলকাতায় থাকে। আমার নেংটাবেলার বন্ধু।

তারক তো মৃত্যুঞ্জয়কে ওঁর ডাকনামেই ডাকে।

মৃত্যুঞ্জয় বললেন, তোর কাছে একটা মতলব নিয়ে এসেছি তারক। বাড়িতে বাবার নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করব। তার জন্য একটু শলাপরামর্শ করব।

অপেক্ষারত রুগিদের বললেন—একটু বসতে হবে। একজন বড় ডাক্তার এয়িচেন, ওঁর সঙ্গে প্রাইভেট কথা আছে।

তারক বললেন—চ', ভিতরে চ'।

ওঁর বসার জায়গার ডানদিকে একটা টুল, তার পিছনে একটা বেড। আর ডানদিকে একটা ঘর। ঘরের সবুজ দরজা ভেজানো। দরজার গায়ে কালো অক্ষরে লেখা আছে—অপারেশন থিয়েটার।

ডা. মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলেন ডা. তারক।

এই ঘরে একটা বেড। দেয়ালে একটা সুন্দরীর মুখ, কিন্তু দেহে কোনও চামড়া নেই। হার্ট-লাং-লিভার-কিডনি-ইনটেসস্টাইন-ইউরেটাস সব দেখানো আছে। এ-ছবি দেখলে কাঞ্চনে না হোক, কামিনীতে বিতৃষ্ণা আসতে পারে। বেডের ওপর ঝুলছে একটা শেড দেওয়া আলো। স্যালাইন অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে। জল ফোটানোর ব্যবস্থা এবং একটা সাদা কলাইকরা ট্রে-র ওপর ছুরি, কাঁচি, সন্না ইত্যাদি কিছু যন্ত্রপাতি আছে। ফোঁড়াটোড়া কাটা, অর্শের বলি ফাটানো, কেটে গেলে সেলাই করা, খুব দরকারে এম.টি.পি. যাকে গ্রাম্যভাষায় পেটখসানো বলে।

অপারেশন টেবিলের ওপরে বন্ধুকে বসালেন তারক। নিজে টুলে বসলেন। বললেন, পাক্কা তিন বছর পর দেখা। বাড়িতে আসিস না? মৃত্যুঞ্জয় বলেন, বাবা চলে যাবার পর আসা-যাওয়া কমে গেছে। এসেছি যাহোক—কিন্তু তোর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।

তারক বলে—আরে তুই আসবি কেন বস? জানলে আমিই দেখা করে আসতাম। যাক গে, তোর ছেলের খবর বল। এমবিবিএস তো পাশ করে গেছে...।

—হ্যাঁ। তোদের শুভেচ্ছায়। চণ্ডিগড়ে এমডি করতে গেছে। ডার্মাটোলজিতে।

—কেন ডার্মা কেন? স্কিনের ডাক্তার হয়ে কী হবে? এখন হল হার্টের বাজার। ক্যানসারের বাজারটাও বেশ খুলেছে।

মৃত্যুঞ্জয় বললেন—আমার ছেলের হচ্ছে গে সুখী নেচার। ওর মায়ের জন্য এমন পানা হয়েছে। একটাই তো নিধি। খাইয়ে দিলে ভালো। ওইজন্যই চামড়ায় দিলাম। ছেলে ঘুমোতে বড় ভালোবাসে।

—ঘুমের সঙ্গে চামড়ার কী কানেকশন? তারক জিজ্ঞাসা করেন।

—আরে চামড়ার ডাক্তারকে রাতে কেউ ডাকে না। রাতবিরেতে চামড়ার রুগির ক্রাইসিস হয় না। আর চামড়ার রোগ সারে না, রুগি একবার এলে দু-তিন বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। তাছাড়া যদি চাকরি করতে হয়, হুজ্জোতি হবে না। পেশেন্ট পার্টি ইট ছুড়বে না। কারণ চামড়ার রুগি মরে না।

তারক নিঃসন্তান। মাঝবয়েসে ওর ছোট শালির মেয়েকে ঘরে এনে বড় করে বিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করে, তোর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ভালো তো?

—আরো মেয়েকে তো ওরা মাথায় তুলে রেখেছে। জামাইয়ের দুটো বাস, দুটো টাটা সুমো খাটে। কিন্তু বাড়িতে আগে চাউ ঢোকেনি। মেয়ে তো চাউ, পাস্তা-ফাস্তা, পুডিং আরও সব রকমারি আইটেম বানায়। টিভি দেখে শিখেছে তো।

—চেম্বার কেমন চলছে? মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করেন।

গড়াই একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়ার ভিতরে ক্ষোভ। ডাউন। বাজার একেবারে ডাউন। একটা নার্সিং হোম হয়েছে, দিনের বেলায় আবার স্পেশালিস্ট সেন্টার। বর্ধমান থেকে ডাক্তার আসছে। দুটো ওষুধের দোকানে ডাক্তার বসছে। গণ্ডাখানেক হোমিওপ্যাথ ছিটিয়ে আছে। তার ওপরে বড় বিপদটা হল হেলথ সেন্টারে এখন ডাক্তার থাকে। কত রুগি আছে এধারে আট-দশটা গাঁয়ে? গরিবরা সরকারি হাসপাতালে যাচ্ছে, বড়লোকরা নার্সিং হোমে। আমার কাছে রুগি আসবে কেন আর?

মৃত্যুঞ্জয় বললেন—আমিও শুনেছি হাসপাতালে ডাক্তার থাকে। এজন্যই মনে হল তোর চেম্বার ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বাইরের বেঞ্চিগুলো ভর্তি থাকে অন্য সময়।

তারক বলেন—আগের দিন হলে কি এসময়ে তোর সঙ্গে গপ্পো করতে পারতাম? দুপুরে গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতাম।

মৃত্যুঞ্জয় কপাল কুঁচকে বলেন—তো ডাক্তার থাকে যে বড়? কেন?

তারক বলেন—কে জানে কী মধু এখানে? লেডি ডাক্তার। কোয়ার্টারেই পড়ে থাকে।

—কুমারী?

—কুমারী-টুমারী কিনা কী করে বলব? তবে যদ্দূর জানি বিয়ে হয়নি। তবে আজকাল বিয়ে হলেও বোঝা যায় না। শাখা-সিঁদুরের পাট তো উঠে গেছে। আমার মেয়ে কিন্তু শাখা-সিঁদুর পরে। এই হাসপাতালের নতুন ডাক্তার খুব স্টাইলে থাকে। ব্যাটাছেলেদের মতো ড্রেস পরে। শুনেছি নাকি সিগারেটও খায়।

—খেলুড়ে?

—আমি কী করে জানব? খেলতে গেছি নাকি? তারকের চোখে কারুকাজ।

তারকের জন্য মৃত্যুঞ্জয়ও চিন্তিত।—চিরকাল শুনে আসছি হেলথ সেন্টারে ডাক্তার থাকে না, থাকলেও সপ্তাহে দু-তিন দিন। হাটবারের মতো। লোক সেই দিনগুলোতেই আসে। এর কী হল যে এখানে পড়ে থাকে!

—হ্যাঁ ভাই। শুনেছি ওর ঠাকুর মাকেও এখানে নিয়ে এসেছে।

মৃত্যুঞ্জয় বলেন—চিন্তায় ফেললি। তাহলে কি আমার দাতব্য চিকিৎসালয়ে রুগি হবে না?

তারক বললেন—তা হবে না একদম তা কেন? গুড়াপ থেকে ঝাপানডাঙা তো তিন কিলোমিটার দূর। আজকালকার লোক হাঁটতে চায় না। অলস হয়ে গেছে। সব কাছাকাছি চায়। তোদের ওই দিকের কিছু লোকজন নিশ্চয়ই যাবে। তাছাড়া এই দিদিমণি কি চিরকাল থাকছে নাকি?

—ঠিক কথা। মৃত্যুঞ্জয় বলেন। লোক আসবে না হতেই পারে না। প্রতিটি মানুষের রোগ। ভালো ডাক্তার পেলে রুগি হবেই। ওখানে ডাক্তার কাকে রাখা যায়, এ নিয়ে পরামর্শ করতেই এইচি। আমাদের গাঁয়ের অশ্বিনী রেলে কাজ করত, ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি পাশ দিয়েছে। বলেছিল দাতব্য চিকিৎসালয় করলে ও বসবে। আমি ওকে কিছু ধরে দেব, ওষুধপত্র যা লাগে দেব। এখন অশ্বিনী বলছে—রিটায়ার করেচি, শিবাইচণ্ডীতে ভগ্নীপতির সারের দোকান আছে। ওই দোকানের বারান্দায় নিজের চেম্বার দেব ভাবচি। এখানে সন্ধের পর বসতে পারি। সন্ধেতে বসাব কেন? একে হোমিওপ্যাথি, তা-ও ডাকযোগে। তাতেই পোঙায় এত রস। ওকে আর রিকোয়েস্ট করব না। এধারে যারা বসে তাদের কাউকে রাজি করাতে পারবি কি? মাসে মাসে কিছু দেব।

তারক বললেন—মনে হয় না ওরা কেউ যাবে। তবে আমি তো এখন সমিতির প্রেসিডেন্ট, বলে দেখতে পারি।

—সমিতি? ডাক্তাররা সব মিলে অ্যাসোসিয়েশন করেছিস বুঝি?

—না, ওটা গুড়াপ হাটতলা ব্যবসায়ী সমিতি।

—ব্যবসায়ী সমিতির মধ্যে ডাক্তার?

—অবাক হবার কী হল? ছোটবেলায় রচনা বইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিল। ওখানে লেখা ছিল তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। আমরাও কি চিকিৎসা ব্যবসায়ী না?

—ও। এর বেশি কিছু বললেন না মৃত্যুঞ্জয়।

তারক আবার বলতে লাগলেন—প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটু রিকোয়েস্ট করতে পারি। একটা নোবেল কাজে অংশ নেওয়া...। তবে গ্যারান্টি দিতে পারব না ভাই। ওরা এটা-ওটা বলে ঠিক কাটিয়ে দেবে। নোবেল কাজ ঠিক আছে। আমি তো ওটাই বলব। কিন্তু ঘরের খেয়ে বনের মোষ....।

মৃত্যুঞ্জয় বলেন—তা হলে কি আমার স্বপ্নটা ইয়ে হয়ে যাবে? আমার পক্ষে তো এসে সম্ভব নয়, ভেবেছিলাম বাবার স্মৃতিতে একটা দাতব্য চিকিৎসালয়....বাবা খরচাপাতি করে ডাক্তারিটা পড়িয়েছিলেন...।

তারক বললেন—এক কাজ কর। উদ্বোধনটা করিয়ে দে। উদ্বোধনটাই আসল। উদ্বোধনের পর তো কত কিছুই বন্ধ হয়ে যায়..। আমিও দেখছি কী করা যায়।

একটু আশার আলো দেখতে পেলেন মৃত্যুঞ্জয়। ও হয়তো এবার বলবে—আমিই না হয় বসব'খনে হপ্তায় দুদিন...। আসলে এটাই তো বলতে চেয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। এখানে আসার উদ্দেশ্য তো তাই। মৃত্যুঞ্জয় আশা করেছিলেন তারক নিজে থেকেই বলবে—ডাক্তার নিয়ে ভাবছিস কেন? আমি তো আছি। কিন্তু বলল না তো। মৃত্যুঞ্জয় নিজে থেকেও বলতে পারছেন না, কারণ একটা কাঁটা রয়ে গেছে ওর জীবনে।

তারক আর মৃত্যুঞ্জয় একই ক্লাসে পড়ত ক্লাস এইট অবধি। তারপর তারক পিছিয়ে পড়ে। তারক আর মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। তারক মৃত্যুঞ্জয়কে ডাকনাম জীবন বলেই ডাকত। তারকের মায়ের হাতের মাছের টক খেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়, আবার মৃত্যুঞ্জয়ের মায়ের হাতের পায়েস খেয়েছে তারক। একই গ্রামে বাস। দুজনেরই অ্যাটলাস সাইকেল, ঝাপানডাঙার চড়কের মেলায় একইসঙ্গে কালো চশমা কিনেছে দুজনে, লুকিয়ে সিগারেট। তারকের বাবার এনামে-ওনামে বাষট্টি বিঘে জমি, মৃত্যুঞ্জয়ের বাবার ভাগে আটচল্লিশ বিঘে। দুই পরিবারই যথেষ্ট সম্পন্ন গৃহস্থ। হয়তো তাই ওদের মধ্যে যথেষ্ট ভাব

গ্রাম ছিল কী সুন্দর ফুলে ফুলে অলি,
বিষে বিষে শেষ ওরা, গ্রামে দলাদলি
মানুষে মানুষে ছিল ভাই ভাই ভাব
কতই শান্তি ছিল, যদিও অভাব
মান্যজনে মান পেত, গরিব পেত দয়া,
বললে লোকে কথা শুনত, করিত না তর্ক...

মিলল না। না মিলুক গে। বহুদিন পরে অন্তরে কেমন কাব্য জেগেছে। কাব্যের প্রজাপতি। চেম্বারে চেম্বারে প্র্যাকটিসের ব্যস্ততায় এইসব সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রজাপতি শুঁয়োপোকা হয়েই থাকে।

সেগুনের একটা হলুদ পাতা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ঠিক মৃত্যুঞ্জয় মাসচটকের কোলে এসে পড়ল। দু-পাশের রাস্তায় এবার সামাজিক বন। দু'-একটা সেগুন আর সব আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস। মনের মধ্যে কী একটা হচ্ছে। কাব্য কাব্য ভাব, ছন্দের অভাব। বমি আসব আসব করছে অথচ হচ্ছে না টাইপের। কবিতা পাচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে না। অনেক রোগের মতোই কাব্যরোগও বোধহয় জেনেটিক।

বাবার ছিল, এটা আগে জানা ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর নীল মলাটের ডায়েরিটার খোঁজ না হলে জানাই যেত না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের গোয়ালঘরে কী একটা বই পেয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ছিল। চর্যাপদ, চর্যাপদ। ওটা না পেলে জানা যেত, বাংলা ভাষা কত পুরোনো? পরে, একটা সুটকেসে আরও সব পুঁথি আবিষ্কার করেছেন মৃত্যুঞ্জয় যা ব্রজবিহারীর সাহিত্যপ্রীতি প্রমাণ করে। যথা—রাই উন্মাদিনী, পাষাণের কান্না, প্রেমের আলেয়া, বাৎসায়ন ঋষির উপদেশ, যাবার বেলায় পিছু ডেকো না...। এই গ্রন্থসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মুনিষ ডাকিয়ে আম-বকুলের পোকামারার ওষুধ মেটাসিড স্প্রে করিয়েছিলেন।

যেদিন উদ্বোধনটা হবে, সেদিন যে বক্তৃতা দেবেন, সেটা কাব্যে বললে কেমন হয়? অনেকটা এরকম—

পিতঃ, বহু ঋণে বেঁধেছ আমারে
সাধ্য নাই পিতৃঋণ শোধ করিবারে
তুমি ছিলে মহাপ্রাণ, পুত্রবৎসল...।

তারপর, এই নীল আকাশের নীচে, অনন্ত চরাচর ব্যাপী সবুজে সহজ সত্য কথাটা বুকের ভিতরে এল—লইয়াছি কত টাকা করি কত ছল।

কিন্তু এটা কি প্রকাশ্যে বলা যায়?

মৃত্যুঞ্জয়ের পুরোনো কথা মনে পড়ে। কত টাকা কতভাবে উড়িয়েছে। অনসূয়া, বনশ্রী, আলপনাদের কথা মনে এল। অচিন্ত্য, সর্বজিৎ, পিনাকীদের কথাও। মেট্রো, লাইস হাউস, অনাদি কেবিন। থার্ড ইয়ারের পর মোকাম্বো, অলিম্পিয়া...। যাক কে। ওসব নিতান্তই প্রাইভেট। এরপর—

তুমি যবে শয্যা নিয়া ডাকিতেছ মোরে
আমি মূঢ় মোহগ্রস্ত প্র্যাকটিসের ঘোরে।

এটা অনুতাপ।

বেশ হচ্ছে তো। এই রিকশাতে বসেই তো বেশ হচ্ছে। বাড়ি গিয়েই লিখে নিতে হবে।

এমবিবিএস পাশ করার পর প্রথম চাকরিটার সঙ্গে সঙ্গেই তো প্র্যাকটিস। চার টাকা ফি। ডাক্তারির কী-ই বা জানা ছিল তখন। জ্বর-জারি পেট খারাপ। খারাপ কিছু বুঝলেই সুধাংশু ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, বুক কিংবা ফুসফুসের কিছু বুঝলেই আরএন চ্যাটার্জি। উনি তো বেলঘরিয়াতেই

থাকতেন। আস্তে আস্তে ডাক্তারি শিখেছেন মৃত্যুঞ্জয়। কিংবা পয়সা রোজগারের নানা কায়দা তাড়াতাড়িই শিখে নিতে পেরেছেন।

রিকশাওয়ালাটি বলল, হাসপাতালে কার জন্য যাবেন?

মৃত্যুঞ্জয় বললেন, নিজের জন্য।

আপনার কী রোগ?

কঠিন প্রশ্ন। রিকশার টায়ারের সঙ্গে রাস্তার মোরামের কথা হচ্ছে খরখর-খরখর। আমার একটু হাইপার টেনশন। বি.পি. হান্ড্রেড বাই ওয়ান ফিফটি। ওষুধ খেয়েও। একটু ইসেনোফিল বেশি। একটু কুশিং সিনড্রোম, একটু ডারমাটো মাওয়াসাইটিস, একটু এনলার্জড প্রস্টেট, চোখের নীচটা ফোলা ফোলা, লোকে ভাবে খুব মাল খাই। কিন্তু বড় রোগটা হল শান্তি পাই না। কিছুতেই শান্তি নাই রে ভাই...। সবটাই মনে মনে বললেন মৃত্যুঞ্জয়। রিকশার চাকার সঙ্গে রাস্তার মোরামের খরখর...।

রিকশাওয়ালাটি বলল—ওই যে হাসপাতাল।

আর পাঁচটা গ্রামীণ হাসপাতাল যেমন হয়, এটাও তেমনই। লাল ত্রিকোণের ছবির দুই পাশে স্বামী-স্ত্রী, মাঝখানে সন্তান। ত্রিকোণের মাঝখানে পোস্টার বকেয়া ডি.এ. দিতে হবে। পোলিওর টিকা...এডস...স্তন্যদুগ্ধ...। সামনে দুটো চায়ের দোকানের গুমটি, ওখানে পাউরুটি-আলুর দম, দুটো কুকুর, সিঁড়িতে পানের পিক, যেমন হয় আর কি। তবে একটু পরিষ্কার। কোথাও গজ-তুলো পড়ে নেই, সামনে একটাও শুয়োর নেই। হাসপাতালের ভিতরে ফিনাইল-লাইজল মেশানো গন্ধ। লম্বা বারান্দায় পর পর ঘর। একটা বড় ঘরের সামনে আউটডোর লেখা।

এখন বেলা ক'টা? একটা চল্লিশ। হাসপাতালে বেশ ভিড় আছে এখনও। আউটডোরের ভিতরে টেবিলে দুজন। একজন নার্স সাদা পোশাকে। একটা কমবয়সি মেয়ে, তিরিশের কমই তো মনে হয়, রোগা পাতলা, সালোয়ার কামিজ পরা, রুগি দেখছে। টুলে বসা একটা মেয়ের চোখের তলা উলটে দেখল, জিভ দেখল। ওর হাতে, কনুই-এর ওপর চার-পাঁচটা মাদুলি, শিকড়। ডাক্তার দিদিমণি বলল, তোমার চেয়ে তো তোমার এসব গয়নার ওজন বেশি। বড়িগুলো খেয়ো, খাবারের পরে দু'বার, আর মাছ-টাছ হলে স্বামী আর ছেলের পাতে সব না দিয়ে নিজেও খেয়ো। একদম সমান সমান ভাগ, বুঝলে?

মেয়েটা জিভ বের করে দাঁতে কাটল। মানে—ছি ছি, এমন কথা বলে?

এবার মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে চোখ পড়ল লেডি ডাক্তারের। এরকম চেহারার কোনও রুগি তো আসে না, নেতারা তো ডেকে পাঠান। সারপ্রাইজ চেকিং করছে নাকি কোনও নেতা বা মন্ত্রী? ও বোধহয় এখন

দেখতে অনেকটা ওদের মতোই হয়ে গেছে। চোখের তলাটা ফোলা, গলায় তিনটে ভাঁজ, ভুঁড়িটাও হয়ে গেছে...।

মেয়েটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কিছু বলবেন স্যার?

মৃত্যুঞ্জয় বলেন—আমি একজন ডাক্তার। কাছেই ঝাপানডাঙায় আমার বাড়ি। এখন অবশ্য কলকাতায় প্র্যাকটিস করি। আপনার সঙ্গে একটু দরকার। পার্সোনাল।

মেয়েটি বলে—একটু ফাঁকা হয়ে নি, কেমন?

একজনকে ডেকে বলে, অনিল, এঁনাকে আমার ঘরে বসাও।

মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছে করছে এখানে থাকতে। বহুদিনের পুরোনো স্মৃতি উড়ে আসছে। ওঁর সেই জুট মিলের ডিসপেনসারি। তবে ওটা ঠিক এরকম নয়। এরকম গ্রামীণ হাসপাতালে অবশ্য কখনও কাজ করেনি।

মৃত্যুঞ্জয় বলেন—ওখানে একা বসে কী করব? এখানেই থাকি?

—থাকবেন? থাকুন। একটা চেয়ার নিয়ে এসো অনিল...। এখানে থাকে, সেটা খুব একটা মনঃপুত হল না মনে হল।

জবা দলুই...। ডাকল ম্যাডাম। অনিল ওই নামটাই আবার। এক মহিলা এল, কোলে বাচ্চা। বাচ্চাটার বয়স বছর খানেক হবে।

—কী হয়েছে?

—বাচ্চাটা হাগছে না।

—ক'দিন?

—তিন দিন।

—আগেও এমন হয়েছে? দু'-এক দিন পরপর হাগে, নাকি রোজই?

—ওজই তো হাগে। কিন্তু ক'দিন পরে পাদলা হাগছিল, তখুন ওষুদের দোকানে গে বল্লাম তো এই ওষুদটা দিল।

একটা ওষুধের রুপোলি মোড়ক দেখাল মেয়েটা।

ম্যাডাম কপাল-কুঁচকে দেখল। মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, মনে হয় নরফ্লকস-টি। বাচ্চার মাকে জিজ্ঞাসা করল—ক'টা খাইয়েছ?

—দুইটা।

ওই দোকানে গিয়ে বলো—আটকে গেছে, কী করবেন করুন। পেট খারাপ হলে নুন-চিনির জল। এইটুকু নুন, দু-চিমটি চিনি, বারবার। পাশের টেবিলে শুইয়ে দেয় বাচ্চাটাকে। তলপেট টিপে দেখল। ম্যাডাম বলল, অনিল, প্যানটা নিয়ে এসো। নার্সকে বলল, গ্লাভসটা বার করুন। নার্স জিজ্ঞাসা করল, ডুস দেবেন? ম্যাডাম বলল—মনে তো হল স্টুল খুব একটা হার্ড হয়নি। অন্য একটু বুদ্ধি করে দেখি..।

আউটডোরের ঘরটা বেশ বড়সড়। অনিল প্যান নিয়ে এল, কলাই করা। ম্যাডাম মেয়ের মাকে নিয়ে এক কোণে গেল। গ্লাভস পরে নিল হাতে। প্যানের দু'পাশে বাচ্চাটার দুটো পা টেনে নিল। বাচ্চাটার মাকে বলল ধরে থাকতে। ম্যাডাম নিজেও মেঝেতে একটা কাগজ পেতে বসে গেলেন। গ্লাভস-এর উপর দিয়েই মাঝের আঙুলটায় ভেসেলিন মাখিয়ে আঙুলটা গুহ্যদেশে প্রবিষ্ট করিয়ে দিল, বোধহয় নাড়ল, স্কুপ করল। একটা শক্ত গুটলি বেরিয়ে এল। গুটলিটা বেরিয়ে যাবার পরই বাচ্চাটার পায়খানায় প্যানটা প্রায় ভরে গেল। এবার ওর মাকে বলল—হাসপাতালের পায়খানায় গিয়ে এগুলো ঢেলে এসো, আর ওখানে জল আছে। ভালো করে ধুয়ে দিও।

মৃত্যুঞ্জয় দেখল এখনও বাইরে দশ-বারোজন রয়েছে। ক্ষিধেটাও পেয়েছে। বাইরের পাউরুটি-আলুরদম চলবে না। দু-চারটে বিস্কুট খেয়ে নিয়ে আজই ব্যাপারটা ফয়সলা করে নিলে ভালো। যদি রাজি না হয়, তাহলে তো মিটেই গেল। তখন অন্য ভাবনা।

এবার বাচ্চাটার নাম জিজ্ঞাসা করল ম্যাডাম। টিকিট হবে। আগেই তো টিকিট করার ছিল।

বাচ্চার নাম কী?

বাজাজ দলুই।

বাজাজ?

আজ্ঞে।

এমন নাম তো শুনিনি? বাজাজ তো ফ্যান হয়, গিজার হয়—জল গরম করার।

ট্যাকটরও হয় আজ্ঞে।

হ্যাঁ, ট্র্যাক্টরও হয়। ম্যাডাম বলে। তো ট্র্যাক্টরের নামে ছেলের নাম রেখেছ?

জবা বলে, আমি না, ছেলের বাপ।

য্যাখন কর্তাবাবু ট্যাকটর কিনল, তারপর দিন ও জন্মাল। ম্যাডাম কী বুঝল কে জানে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ভূস্বামী ঘরের ছেলে। মৃত্যুঞ্জয় বুঝে নিল ব্যাপারটা। এই বাচ্চাটির বাবা নিশ্চয়ই কোনও জোতদারের

বাঁধা মুনিষ। বাবুবাড়ির সুখ-দুঃখই বাঁধা-মুনিষের সুখ-দুঃখ হয়। বাবুরা হয়তো আগে ট্রাকটর ভাড়া করে কাজ চালাত। ট্রাক্টর কিনল, সেই সুখে বাঁধা মুনিষ নিজের ছেলের নাম ট্রাক্টরের নামে রেখে দিল।

একটা বাড়িতে রতন টাটাও ছিল। দুই ভাই—রতন বড় ভাই, টাটা ছোট ভাই। টাটা কোম্পানির কোনও চাষের যন্ত্রের নামের নাম দেখা গেছে। পুলিশ, দারোগা এসব নামও হয়। এরা সব অপূর্ণ ইচ্ছে।

এবার একটা সাপে-কাটা কেস। সেরেছে। কোনও কথাই তো বলা যাবে না।

একটা ভ্যানে করে একটা বউ। ভ্যানওয়ালা আর একজন একটা চাদরে শুইয়ে চাদরটাকে স্ট্রেচার বানিয়ে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আর একজন মাঝবয়সি। মুখে দাড়ি।

লোকটা বলল, চিতি সাপ।

কী করে বুঝলেন? ম্যাডাম বললেন।

আমি তো ওঝা। বুঝি।

ওঝা! ঝাড়ফুঁক না করে এখানে এলেন যে বড়।

ওঝা বলে, সে একটু করিচি। কিন্তু ওতে কিছু হয় না। বিষ কম থাকলে ভালো হয়ে যায় অনেক সময়, আমাদের কারিকুরি কিছু নাই, যা করি, মনের সান্ত্বনা।

সত্যি অবাক হয় মৃত্যুঞ্জয়। গ্রাম এতটাই পালটে গেছে নাকি? কী করে হল? বিজ্ঞান আন্দোলন? এটা আগে ছিল, এখন কই? এসব কি আগের এফেক্ট? তাই বলে কি ন্যাবার মালা নেই? মসজিদে পানিপড়া নেই? অত তাড়াতাড়ি যায় না।

ওঝাটি বলল—হালকা করে বাঁধন দিয়েছি। ঠিক আছে না!

ম্যাডাম বলে, একদম ঠিক। ম্যাডাম নাড়ি দেখছে। বলছে ঠিক সময় এনেছ। অ্যান্টি ভেনাম আছে এখানে।

মানুষের মানসিকতা কি এগিয়েছে তা হলে? তাহলে যে এতগুলো চ্যানেলে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, বশীকরণ, ফেংশুই, বাস্তুবিদ...। এদের বিচিত্র পোশাক, গলায় সোনার হার। এদের নাকি অনেক আগে থেকে বুকিং করতে হয়। এরা নাকি বিএমডাবলু গাড়ি চড়ে। কাদের পয়সায়? এইসব মানুষই তো ওদের পয়সা দেয়। কোন মানুষ? শহুরে মানুষেরা। শহরের লোক কি তবে বেশি কুসংস্কারগ্রস্ত? কে জানে? এই একটা ঘটনা দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তা ছাড়া সংস্কার-কুসংস্কার হল কি বলে রিলেটিভ ব্যাপার। নিজের আঙুলের দিকে নজর পড়ে। দুটো পাথর। পাথর তো নয়, রত্ন। গোমেদ আর প্রবাল। প্রবাল মঙ্গলের জন্য, আর গোমেদ কীসের জন্য যেন মনে নেই। গুপ্ত শত্রু যাতে ক্ষতি

করতে না পারে ওই জন্যে। না-না, ওই জন্য তো কি একটা যন্ত্রম দিয়েছিল। এসব গিন্নীর ব্যাপার। গোমেদ বোধ হয় ব্লাড সার্কুলেশনের জন্য। কে জানে কী কাজ হয়? উপকার হোক না হোক, ক্ষতি তো নেই...।

ম্যাডাম পেশেন্টকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। বেড-এ। মৃত্যুঞ্জয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, গুডলাক।

এবার আর মৃত্যুঞ্জয়ের কাজ নেই এখানে। যে কথা বলতে এসেছিলেন সেটা হাসপাতালের ব্যস্ততার মধ্যে বলা সম্ভব নয় বোঝাই গেল। বাড়িতে গিয়ে সন্ধের পরে বলতে হবে। হাসপাতালের বাইরে কয়েকটা ছোট বাড়ি, কোয়ার্টার যেমন হয়। ম্যাডাম কি কোয়ার্টারেই থাকেন! হাসপাতালের একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন মৃত্যুঞ্জয়। জানলেন—কোয়ার্টার ভাঙাচোরা, ছাত থেকে জল পড়ে, আর একটু এগিয়ে হেলাবটতলার পাশে নতুন পাড়া, ওখানে রতন বিশ্বাসের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। ডাক্তারের নাম ইন্দ্রাণী রায়। এবার আর কী কাজ। চলে গেলেই হয়। সাপে-কাটা মেয়েটার বাড়ির লোকজন বসে আছে সিঁড়িতে। বাইরে একটা রিকশাও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করল না। কী মনে হল শেষটা দেখেই যাওয়া যাবে। কী আশ্চর্য কাণ্ড, সাপে-কাটা মেয়েটার আত্মীয়দের মতো অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করল, এবং বুকের ভেতরে রহস্যময় কেউ বলছে বাঁচবে তো বাঁচবে তো? মৃত্যুঞ্জয় বলছেন, দেখা যাক, দেখা যাক। মৃত্যুঞ্জয় আকাশে মুখ তোলেন। মেঘ ভাসছে। যেন মেঘকেই বললেন, যেন বাঁচে। আসলে ঈশ্বরকেই বললেন।

মৃত্যুঞ্জয় রিকশায় উঠলেন না। চায়ের দোকান একটা বন্ধ হয়ে গেছে, অন্যটা বন্ধ করার তোড়জোড় করছে। ওদের বেঞ্চিতে বসলেন। বিস্কুটের প্যাকেট রাখে ওরা। দশ টাকার একটা প্যাকেট কিনে দু'-তিনটে কুকুরকে দিলেন। এক কাপ চা বানিয়ে দিল, ফ্রেশ। বহুদিন পর এরকম বেঞ্চিতে বসে গ্রাম্য চা।

দোকান বন্ধ হল। বেঞ্চিটা ঢুকিয়ে দেবে ভিতরে।

মৃতুঞ্জয় বাইরে গিয়ে এক পাক ঘুরে এসে তারপর সিঁড়িতেই বসলেন।

মেয়েটির স্বামীর নাম রাজা। ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করো তুমি?

বলল—বাবুবাড়িতে বাবা কাজ করত। আমিও ছোটবেলায় ওদের বাড়ির কাজকর্ম করতাম। তারপর টাক্টর চালানো শিখিয়ে দিল, ওরা নিজেদের জমি চষে, ভাড়াও দেয়। আমি টাক্টর চালাই। টাক্টর বলছি বটে, আসলে টারাকটার। রফলা উচ্চারণ করার চেষ্টা করে।

মৃত্যুঞ্জয় বলেন, স্কুলে যাওনি?

গেছি তো, এইট পাশ।

—ও আচ্ছা। সঙ্গে কারা?

পড়শিরা এসেছে। শ্বশুরবাড়ি দূরে। দু' ঘণ্টার সাইকেল।

বাবা-মা আছেন।

বাবা সগ্গে। মা আছে।

আচ্ছা তোমার নাম রাজা, কেউ খেপায় না!

ও বলে, ধুর, নাম নিয়ে কার কী যায় আসে?

এরকম গল্প করতে করতে আরও ঘণ্টা দেড়-দুই গেল।

নার্স এসে বলল—ভালো আছে। নাড়ি বেড়েছে। জ্ঞান আছে।

হাততালি দিল কে? কেউ না। ওটা বুকের ভিতরে।

একটু পরেই ম্যাডাম এল।

মৃত্যুঞ্জয়কে দেখে বলল—কী ব্যাপার, আপনি এখনও এখানে?

মৃত্যুঞ্জয় হাসলেন। বললেন, কেসটা নিয়ে আমিও...।

ম্যাডাম বলল—আমি একটু পরেই মেয়েটাকে বর্ধমানে পাঠিয়ে দেব। পেশেন্ট স্টেবল আছে। কমপ্লিকেশন হতে পারে। এখানে তো সবরকম ব্যবস্থা নেই। আপনি কী বলতে এসেছিলেন? খুব জরুরি কিছু?

মৃত্যুঞ্জয় বললেন, তেমন জরুরি নয়, দুদিন পরেও বলা যাবে। আমি অপেক্ষা করছিলাম কেসটার জন্য। কী হয়...এখন বেশ ভালো লাগছে।

ম্যাডামের মুখে যেন একটা চন্দ্রমল্লিকা ফুটল।—ওমা, তাই?

মৃত্যুঞ্জয় রিকশায় উঠলেন। অন্য রিকশাওয়ালা। স্টেশন যাবেন। সূর্য হেলে পড়েছে। রিকশা যাচ্ছে। চরাচর জোড়া বিস্তীর্ণ সবুজের ওপারে সূর্য। এক্কেবারে রিভোফ্লোবিনের মতো রং। প্রকৃতি জুড়ে অক্সিটোসিন।

একদিন পর সন্ধের দিকে আবার গুড়াপ স্টেশনে। সেই রিকশাওয়ালাটাকে দেখতে পেলেন মৃত্যুঞ্জয়, দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে একটা গামছা পেঁচানো। প্রথমে ওর পিঠের দিকটায় গেলেন। হারপিসের ঘা বেশ ঘন হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করলেন—জ্বালা করে না? খুব জ্বালা করার কথা তো।

—ও করুক গে যাক। কোথায় যাবেন?

—যাবে?

—নিয়ে যাবার জন্যই তো আছি।

ডাক্তার দিদিমণির ঘরে যাব। হেলাবটতলা ছাড়িয়ে নতুন পাড়ার রতন...

—তা বলতে হবে নে। উনার বাড়ি আমার যাওয়া-আসা আছে।

—ও, আচ্ছা।

স্টেশন থেকে খুব বেশি দূর নয়। আগের দিন বাজার থেকে যাবার জন্য দূরত্ব বেশি ছিল। 'নতুন পাড়ায়' ঢোকা হল। বারান্দার গ্রিলে জুঁই লতিয়েছে। বারান্দাতেই একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। আর সেই ম্যাডাম একটা ইজিচেয়ারে বসে আছে। হাতে ধরা মোবাইল, কানে হেডফোন। পরনে একটা ঢোলা পায়জামা ধরনের। কুর্তিও বলা যায় বোধহয়, আর একটা পাঞ্জাবি।

রিকশাটা থামতেই মেয়েটা কান থেকে হেডফোন সরাল। হেডফোনের ছোট্ট বহির্দ্বার থেকে মৃদু ভেসে আসছে 'এসেছিলে পরশু আজ কেন আসোনি।' শচীনদেবের গান। পরশুই তো এসেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। আজও এলেন। একবার বলতে ইচ্ছে করল, পরশুও এসেছিলাম, আজও এলাম। কিন্তু এটা ঠাট্টা-ইয়ার্কির হয়ে যাবে। সেই সম্পর্কটা তো হয়নি। তাছাড়া ওর কাজকর্মের ধরন-ধারণ দেখে ওর ওপর কেমন একটা শ্রদ্ধাভক্তি হচ্ছে।

মেয়েটা বলল—আসুন, আসুন, কী খবর?

মৃত্যুঞ্জয় বললেন—আমিই তো জিজ্ঞাসা করছি কী খবর। ওরা কেমন আছে? সাপে-কাটা মেয়েটা, আর বাচ্চাটা?

মেয়েটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—বেঁচে গেছে, আউট অফ ডেঞ্জার।

এবার রিকশাওয়ালাটা ম্যাডামকে বলতে লাগল—ভালো আছি দিদি। আপনি কেমন আছেন দিদি?

তার মানে 'কী খবর'-টা মৃত্যুঞ্জয়কে বলা হয়নি নাকি? রিকশাওয়ালাকে বলা হয়েছিল? তাই তো মনে হচ্ছে।

দিদিমণি আবার জিজ্ঞাসা করল—তোমার ওই অর্জুনপুরের পেশেন্টের খবর কী?

—এক্কেবারে আরাম হয়ে গেছে দিদি। চাষের কাছে লেগে গেছে ফের।

ম্যাডাম এবার মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাকায়। কী হল, বসুন। বারান্দায় চেয়ারও আছে দুটো প্লাস্টিকের। ম্যাডাম ইজিচেয়ারে আধা শোয়া ছিল, এবার শরীরটা ওঠাল। তুমিও বোসো শিবা।

মৃত্যুঞ্জয় প্লাস্টিকের চেয়ার বসল, পাশের চেয়ারেই রিকশাওয়ালা। একটা ছোট গোল টেবিল, ওখানে অ্যাসট্রে। ভিতরে সিগারেটের অবশেষ। এই মেয়েটা সিগারেট খায় নাকি?—নাকি বাইরের লোকেরা এলে খায়। নিষেধ করে না কেন?

মৃত্যুঞ্জয় হোস্টেল জীবনের পরই সিগারেট ত্যাগ করেছেন।

মেয়েটা এবার মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাকায় আবার।—বলুন কী ব্যাপার?

কীভাবে কথা শুরু করবেন ভেবে পান না মৃত্যুঞ্জয়। বলেন—আপনি খুব ডেডিকেটেড।

—ডেডিকেটেড না, বলতে পারেন ফাঁকি মারি না। পাশ করার পর একটা ওথ নিতে হয়েছিল না আমাদের? হিপোক্রেটিক ওথ।

—হ্যাঁ, ওটা তো নিতে হয়, কিন্তু মেনে চলে ক'জন?

—সে যা হোক। আপনি নিশ্চয়ই এই কথাটা বলতে আসেননি আমাকে...।

—না, সেটা না, আমি দু' স্টেশন দূরে ঝাপানডাঙায় থাকি। থাকি মানে থাকতাম। ওটাই জন্মভূমি। এখন কলকাতার কাছে সাবার্ব-এ প্রাকটিস করি।

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ম্যাডামকে দিলেন।

ম্যাডাম সামান্য দেখে অ্যাসট্রের পাশে রেখে অ্যাসট্রেটা দিয়ে আংশিক চাপা দিল।

—হ্যাঁ, তো? মেয়েটি বলে।

মৃত্যুঞ্জয় বলে—শুনলাম আপনি এখানেই থাকেন। আপনার মাকেও নিয়ে এসেছেন। আমি আমার গ্রামে, পৈতৃক বাড়িতে আমার বাবার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করতে চাই।

যেন একটা হ্যান্ডবিল পড়ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় মাসচটক।

মা নয়, ঠাকুমাকে নিয়ে থাকি। হ্যাঁ, বলে যান।

—এজন্য একজন ডাক্তার দরকার, যিনি ওখানে বসবেন। আপনি তো রবিবার এখানেই থাকেন। রবিবারটা বেশিরভাগ ডাক্তারখানা বা হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ থাকে। সেদিন আমার ডিসপেনসারি চালু থাকবে। আপনি যদি দয়া করে আসেন, আর একটা দিন সন্ধের দিকটা একটু সময় করে...।

বাক্যটা সম্পূর্ণ না করেই থামলেন এবং একটু বেশি বাতাস গ্রহণ করলেন ফুসফুসে।

—কিছু অনারারিয়ামেও ব্যবস্থা রেখেছি।

লেডি ডাক্তার ইন্দ্রাণী রায় বলল—আচ্ছা, আমি ধরুন গেলাম। রুগি দেখলাম, প্রেসক্রিপশন করলাম। কিন্তু ওষুধপত্র?

তারও কিছু কিনে দেব, ধরুন টিংচার আয়োডিন, মারকিউরিক্রোম, বোরিক...

—এসব কাটাছেঁড়ার ওষুধ দিয়ে কী হবে? ম্যাডাম হেসে বলল।

মৃত্যুঞ্জয় বললেন—গাঁয়ে তো মারপিট হয় খুব। হেসেই অবশ্য। তারপর বললেন—অন্য ওষুধও থাকবে নিশ্চই। প্যারাসিটামল, মেট্রানিয়াডাজোল, ক্লোরোকুইন, অ্যালকালি, ও.আর.এস...।

—এসব তো দামি ওষুধ নয়, আপনি মেবিনডাজোল দিতে পারবেন, যা কৃমির উৎপাত, এরিথ্রোমাইসিন? প্যান্টোপ্রাজোল দিতে পারবেন—অ্যাসিড ব্লকার? সেসুরক্সিন-এর মতো ওষুধ দিতে পারবেন?

—বড্ড কস্টলি এসব...।

—তবে আর বাবার স্মৃতি করে লাভ কী?

মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ। এ সময়ে মাথা চুলকানো আনস্মার্টনেস। সোজাসুজিই বললেন—তাহলে যাবেন না, তাই তো?

—যাব না বলিনি। আমার তো যেতেই হয় ওধারে। ঝাপানডাঙা ছাড়িয়ে কুঁদো গ্রামে আমাদের একটা সাবসিডারি হেলথ সেন্টার আছে। আপনাদের গ্রামেও যাই। ওখানে আমাদের হেলথ ওয়ার্কার আছে মালতী সর্দার। আমি যাব। সপ্তাহে দুদিন করে যেতে পারব। এই কারণেই যাব—আপনি আজ ছোট করে শুরু করলে কাল বড় হবে। কাল অন্য কেউ বসবে। কাজটা শুরু হওয়া দরকার।

মৃত্যুঞ্জয় ভাবতেও পারেননি উনি রাজি হয়ে যাবেন। তারক থ' বনে যাবে। এবার তারক নিজে থেকে বলবে আমিও দুদিন বসব। খুব তানাই-মানাই করছিল। ব্যাটা ভুলে গেছে সব। এবার দেখ তুই..।

বাতাস ঢুকল যেন জুঁই ফুলের গন্ধ নিয়ে। বারান্দার শেষে একটা ঘর। ঘরে পর্দা। পর্দা সরে গেলে অন্য একজন মহিলাকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। এবার মহিলা বাইরে এলেন। খুব বৃদ্ধা নন। জিজ্ঞাসা করলেন, চা!

ইন্দ্রাণী বলল—তোমার কিছু করতে হবে না ঠাকমা, আসছি তো আমি।

মৃত্যুঞ্জয় বললেন—না, না—ওসব আবার কী হবে।

ইন্দ্রাণী বলে—দু'মিনিট। আসছি।

চা-চামচের টুংটাং। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে একটা গান আছে না? চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল ডা. ইন্দ্রাণী রায়। তিন কাপ।

ডাক্তার—চা নিয়ে যাও।

মানে?

রিকশাওয়ালাটি চা তুলে নিল।

ওকে ডাক্তার ডাকল কেন?

চায়ে দুটো চুমুক দেবার পর মৃত্যুঞ্জয় বলে, তাহলে আপনার নাম পাবলিসিটি করে দিই?

—পাবলিসিটি আবার কী?

—না, বলছি, উদ্বোধনের দিন অনুষ্ঠানের কার্ডে আপনার নাম..

—হ্যাঁ, লিখে দিন না...

—বেশ। থ্যাঙ্ক ইউ।

কিছুক্ষণ মৌনতার পর বললেন—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? বলছি কি, এই রিকশাওয়ালাকে ডাক্তার বলে ডাকলেন, ও আবার মেনেও নিল...

ইন্দ্রাণী খিলখিল করে হাসল। অনেকটা হাসি। হাসতে হাসতেই বলল—'ও তো ডাক্তার-ই। তবে বলি শুনুন। আমার কাছে ও প্রথমদিন এল, একটা মেয়েকে এনেছিল। পোস্ট ডেলিভারি পেইন উইথ পিউয়্যারপ্যারল ফিভার। বলছে আমার চিকিচ্ছেয় কাজ হল না তাই আপনার কাছে আনলাম।

—কী চিকিৎসা করে ও? ঝাঁড়ফুঁক?

—ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।

রিকশাওয়ালা চা খাচ্ছিল। ও খুব বিনয়ের সঙ্গেই বলল, না আইজ্ঞে, সের'ম কিছু নয়, আমি মোটে তিনটা রোগের ওষুধ জানি। আমার বাপ আমায় কয়ে গিয়েছিল। আর কিছু না।

—কী কী রোগ?

—ওই তো, কান পাকা, হেঁতাল ব্যথা আর অর্শরোগ।

—কী চিকিচ্ছে?

—লতাপাতা।

—কান পাকায় কী দাও?

—কানশিরে পাতার বোঁটা ভেঙে রস।

—হেঁতাল ব্যথাটা কী?

ইন্দ্রাণী বলে দিল—পোস্ট ডেলিভারি পেইন।

—কী ওষুধ?

—বাপ চিনিয়ে দেছিল, গাছের নাম জানি না। গাছের গায়ে শুঁড় আচে।

মৃত্যুঞ্জয় বললেন, আপনি বাঁচালেন ম্যাডাম। আবার একদিন এসে কথা বলে যাব আমি।

রিকশাওয়ালাও বলল—আসি দিদি।

ইন্দ্রাণী রায় ওর পিঠে হাত রাখল। রিকশাওয়ালা ককিয়ে উঠল।

—কীরে, পিঠে কী হয়েছে?

—ও কিছু না।

মৃত্যুঞ্জয় বললেন—হারপিস জস্টার।

—তাই? বলেনি তো কিছু, দেখি...কবে থেকে? কাল এসো হাসপাতালে। ওষুধ আছে। দিয়ে দেব।

রিকশাওয়ালাটা ওসব কথা গায়ে না মেখে চালকের সিটে গিয়ে বসে। পিছনের সিটে মৃত্যুঞ্জয়। দিদিমণি রাজি। বেশ একটা শান্তি শান্তি ভাব। আকাশে বরিক পাউডার মাখানো চিলতে চাঁদ। সামাজিক বনে চাঁদের আলোর অ্যানাসথেসিয়া।

সিগারেটখোর মেয়েটার জন্যই ওর কাজটা হতে চলেছে, বাবার আত্মা শান্তি পেতে চলেছে। তবে সিগারেট কি খায়? চোখে তো দেখা হয়নি। খাগ সে সিগ্রেট, বৃথাই রিগ্রেট। তবে ব্যাভার কিন্তু বেশ। বে' থা করেনি। ওর কি বাপ-মা-র দায়িত্ব নেই? রিকশাওয়ালাটার সঙ্গে ভাবসাব হল কী করে?

মৃত্যুঞ্জয় রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসাই করলেন—হ্যাঁ রে, ডাক্তার দিদিমণির সঙ্গে তোর এত ভাব হল কী করে র‍্যা?

—আমুও চিকিচ্ছে করি, উনিও চিকিচ্ছে করেন। তা বাদে আমুও রুগি দেখে টাকা লিই না, উনিও ল্যান না।

—ও ব্বাবা।

—আমুও আমার সুখ-দুঃখের কথা উনাকে বলি, উ-ও সুখ-দুঃখের কথা মোকে বল্যেন।

—বাব্বা! তোদের খুব মিল দেখছি।

—মিল আচে, কিন্তু গরমিলও আচে। নাটকীয়ভাবে এটুকু বলেই রিকশাওয়ালাটা ডানদিকে রিকশা ঘোরাল। বিশাল বটগাছটার তলা দিয়ে যাবার সময় ডান হাতটা হ্যান্ডেল ছেড়ে কপালে ছোঁয়াল।

—মিল তো শুনলাম। এবার গরমিল কিছু কিছু শুনি।

পায়ের উপর পা তুলে বেশ গপ্পো করতে করতে যাওয়া যাবে।

—গরমিল তো অনেক রকমই আছে। তার মধ্যে পরধান হচ্ছে দিদিমণির কম্ম ওর বাপের দায়, আর আমার ধম্ম আমার বাপ যা চায়।

আকাশে ছায়াপথ। ঝিঁঝির শব্দ। দূরে ট্রেন যায়। রাতপাখি ডাকে। হেঁয়ালি হেঁয়ালি।

—বাপের দায় মানে?

—মানে? মানে হল গে—ওই দিদিমণির বাবা হচ্ছেন গে ডাক্তার। কলকাতা শহরে খিদিরপুর আচে, হোতায় বসে।

—ও আচ্ছা।

—রুগি ছুঁলেই দেড়শ' ট্যাকা লেয়।

—বেশ তো।

—রুগি এলেই বেলাড টেস, পেসাব টেস। বর্ধমানের হোটেলে খদ্দের ধরে আনতে পারলে রিকশাওয়ালারা যেমন কমিশল লেয়, ওই দিদিমণির বাপও তেমন কমিশল লেয়। কমিশলে লোভে মিছামিছি টেস করায়।

—হুঁ।

—কমিশলের লোভে শুধুমুদু বুকের কাঠির ফটোক তোলায়।

—নাকি?

—তা বাদে সরকারি বাবুদের মিছা চিকিচ্ছার হিসাব দিয়ে কমিশল লেয়।

মৃত্যুঞ্জয় এবার নিঃশব্দ।

দিদিমণির ইসব মোটে পছন্দ লয়। এজন্য পটে না মোটে। ওই জন্য ঘরে থাকে না। ওই জন্য ঠাকমা লিয়ে চলে আসেছে। তা বাদে উর মা, ঠাকমাকে কুকথা কয়। তাই দিদিমণি বিচার লিল, কী, ঠাকমা উ নিজেই রাখবে।

কী একটা যেন ডেকে উঠল বাইরে। মৃত্যুঞ্জয় কোনও কথা বলেন না আর।

—বাপের কাজ নিজে করে ধম্মে আছে থির।

হাওয়া কি বন্ধ হয়ে গেল? গা-টা একটু জ্বলছে। ইওসিনফিল বাড়ল নাকি? চাঁদটা কি মেঘে ঢাকলো? অন্ধকার।

—আর একটা কথা বলি। শুনছেন বাবু?

আকাশে ছায়াপথ। নক্ষত্রের হীরে-কুঁচি। মৃত্যুঞ্জয় বলেন—বলো।

—আমার বাপ আমায় ক'টা বৃক্ষলতা চিন্যে দে বলেছিল—এই গাছের এই গুণ। চিনে রাখ। এই এই গাছ এই এই ভাবে ব্যাভার করবি, রুগি এলে কখুনো ফির‍্যা দিবি না। সব কাজ আমরা জানি না। কেউ কাপড় বুনে দেচ্ছে, কেউ মাটির বাসন বানায় দেচ্ছে, কেউ হোলার লোহার শাবল খুরপি কোদাল। কোদাল পাই বলেই তো মাটি কোপায়ে দুটো খাই। তাই মানুষের কাজে লাগা মানে আমাদিগের ধার শোধ করা। আমার ঠাকুরদা ছিল রোজা। রোজা মানে বোঝেন তো? ওঝা, ওঝা। জড়িবুটি দিতেন। কম বয়সে মরে যায়। বাবা বেশি বিদ্যে শিখতে পারেনি। যেটুকু শিকেছে, আমাকে দান করি গেছেন। বুঝলেন বাবু। বাপ আমাকে ওষুধের গাছ দে' পয়সা নিতে বারণ করে গেছেন। কয়েছেন গাছ তো ভগবান দেছেন। ফিরি। সেই গাছ দিয়ে পয়সা লিবি কেন? খেটে খাবি।

জোনাকি! উঃ জোনাকি!

আমি বুইজলেন, একটা পাপ কইর‍্যে ফেলাছি। দিদিমণিকে ওই পাপের কথা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু নজ্জায় বলা হয়নি। রিকশাটা একটু থামায় ও। বলল, অন্ধকার। ল্যাম্পোটা ধরাব।

ও দেশলাই জ্বালে। চরাচর ভরা অন্ধকারের মধ্যে উৎসারিত আলোয় রিকসাওয়ালাটির মুখ। ওর নাম শিবা। শিবা, না সেবা?

—পাপের কথাটা বলেই ফেলি আইজ্ঞা। জিজ্ঞাসা নিছিলেন না পিঠের উডা কী? এখন বলি। উডা পাপের চিহ্ন। একটা রুগি বাড়ি গেছিলাম শনিবার। পরথম পোয়াতি। খুব সোন্দর। হেঁতাল ব্যথা। ওষুধ দিলাম। সোমবার দেখতে গেলাম।

ও চুপ করল। মৃত্যুঞ্জয় একটু আঁচ করলেন কী পাপ। সুন্দরী রোগিণী...। কিছু একটা হয়তো...

ও বলে, গিয়ে দেখি ব্যথা নাই। আরাম হয়ে গেছে। মেয়েটার বাচ্চাটা পাশে শুয়ে। মেয়েটার বাবা টাকা দিতে চাইলে। উরা বড়লোক। আমার সামনে ধরা একটা পাঁচশো টাকার নোট বাতাসে কাঁপছে। কী মতি হল...লোভ হল খুব। টাকাটা খপ করে ধরে নিলাম। বাজার থেকে একটা হরলিস নিলাম ছেলেটার জন্য, আর মাখম, আর মঙ্গলবার আমার পিঠ ফুঁড়ে বেরুল পাপ। পাপের চিহ্ন।

কী একটা রাতপাখি বিচ্ছিরিরকম ডেকে উঠল।

দু'পাশের অন্ধকারকে সাপটে ধরতে চাইলেন মৃত্যুঞ্জয়। হাওয়া নেই। গায়ে এত জ্বালা কেন? পাপ? আকাশটা বড্ড ঝুঁকে পড়েছে গায়ের ওপর। আকাশ, ক্ষমা করো। নিজের মাটি, দেশের মাটি, ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা করো। বটবৃক্ষ হে, ক্ষমা করে দাও। চোখে জল আসে কেন, ধুস!

চারিপাশের অন্ধকারে রিকশাটার কেরোসিন-আলোয় ওর মুখে রেডিয়াম।

ও আবার বলে—বাবা আমার সগ্গ থেকে দেখছে, আর বলছে বেশ হয়েছে।

হাওয়া দিচ্ছে ফের। হাওয়া বলছে, আছে আছে আছে। শেষ হয়নি। সহজে শেষ হয় না।

স্টেশন আসছে। রাস্তায় আলো। অন্ধকারের পর আলোই তো আসে চিরকাল।

স্বর্গ থেকে পিতৃপুরুষরা কি সত্যিই দেখছেন?

ডাক্তার, বিশেষণহীন

ধর্মপিতা

কলমির ডগাগুলো লকলকাচ্ছে। নতুন পানি যেন নতুন ভাতারের সোহাগ। বর্ষা পেয়েই সেজে উঠেছে চারদিক। পুকুরে শাপলা, গেঁড়ি-গুগলি গুলগুল। ব্যাঙের ফুর্তি, কচুগাছ নতুন নতুন নতি ছাড়ছে ভুঁইয়ে। জুঁই ফুটছে। এগুলোকেই তো পোকিতি বলে। কী সোন্দর! সবই তেঁনার রহমত। কুঁচো চিংড়ি ধরে এনেছে গুণের দ্যাওর ওর ছাঁকি জালে। চিংড়ি যদি হল তবে একটু কলমির জোগাড় কোত্তি হয়। কলমি তো চোখের সামনেই। সায়িদা একটু কলমির জোগাড়ে পুকুরপাড়ে দাঁড়ায়। শাপলার ডগা দিয়ি চিংড়ি রাঁধলেও খুব স্বাদের হয়। এই রোজার মাসে রাতের বেলা একটু ভালোমন্দ রেঁধি দিতি ইচ্ছে হয়। বাড়িতে তিনজন রোজা-রাখা ব্যাটাছেলে। এ-বছর সায়িদা রোজা রাখেনি। সবাই নিষেধ করল। এ সময় রোজার দরকার নেই। মৌলবি সাহেব কয়ে দিয়েছেন যে গর্ভবতী নারীর জন্য নিয়ম হল গায়ে বল আর শরীরে জোর থাকলি ছয় মাসের গভ্ভকাল পর্যন্ত রোজা রাখা যায়। এরপর দয়ালু আল্লাহ রোজা মকুব করে দিয়েছেন। সায়িদার এখন আটমাসের গভ্ভ। আর ক'দিন পরই কোল ভরবে গো...। পুকুরে নেমে একটু সাঁতার দিতে ইচ্ছে যায়। জলপিপিগুলো কেমন সাঁতরাচ্ছে দেখো। কতদিন হয়ে

গেল সাঁতার দেওয়া হয়নি। বৃষ্টির মধ্যে সাঁতার দিতে কী মজা! সেই ছেলেবেলায় হত। গুঁড়িগুঁড়ি একটু বৃষ্টি নামল আবার। ইলশেগুঁড়ি। ইলিশ মাছ কী ভালোটাই না লাগত! এই পোয়াতিবেলায় ওই গন্ধটা সহ্য হয় না। সেদিন এনিছিল খেতি ইচ্ছে করছে না। ঘরে গিয়ে আবার তো সেই আন্নাঘর। ওদিকে সুয্যি হেলে গেছে। সেই পশ্চিমে, যেদিকে কাবা-মক্কা। আর দেরি করলি চলবে না। আজকের ইফতারে খাজুর, আম, বেসনে ডুবোয়ে আলুভাজা, পরোটা, বুটের ডাল। লতু একটু ভাত পছন্দ করে। লতু মানে লতিফ। লতিফ মানে হ্যাজব্যান। হ্যাজবেনের নাম ধরে ডাকতি নেই। বাড়িতে তো ডাকে না। বাইরে লতু ডাকে, ডাল্লিংও ডাকে আস্তে আস্তে। লতুও। লতু ওর চেয়ে সাত বছরের বড়। ওর যখন বে' হয়েছিল, তখন ওর বয়েস ছিল সতেরো। চার বছর আগে বে' হয়েছে। যদি আজকের দিন হত, তবে ঠিক আরও একবছর-দুবছর পরে বে' বসত। কন্যাশ্রীতে কতকগুলো টাকা পাওয়া যেত। ইস্কুলটাও ছাড়ত না। ইস্কুলে এইট অব্দি পড়েছে। এইট অব্দি তো পাশ-ফেল নেই।

শাশুড়ির ইন্তেকাল হয়ে গেল এক বছর আগে। কেবল পান-দোক্তা খেত। টিভিতে দেখায় তো পান দোক্তায় কী হয়! তেনারও তাই হয়েছিল। মেলা টাকা খরচ হয়ে গেল। এখন সংসারের ভার পড়েছে ওর ওপর। দেওরের বয়েস এখন তেইশ-চব্বিশ হবে। ওর যদ্দিন বে' না হচ্ছে, তদ্দিন কুনও সুরাহা নেই। এই রমজান মাস শেষ হতে আরও সাত দিন। রমজান শেষ হলে ইদ। এবার রথ আর ইদ একদিনে হবে, যদি চাঁদরাতে চাঁদ দেখা যায়। জগৎপুরের রথের মেলায় যাওয়া হবে সেজেগুজে। এই পেট নিয়ে যেতে দেবে না? তাহলে? ইদ আর রথের মেলা একই দিনে আবার কবে হবে? সামনের বার ইদ আরও ক'দিন আগে হয়ে যাবে। তখন কোল আলো করা ছালো। ইদের জামা গায়ে পরিয়ে কপালে নজর না-লাগা কালো টিপ পরিয়ে মেলায় যাওয়া যাবে। না, আর টাইম নষ্ট করা যাবে নি। 'সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।' কত কাজ। ইফতারের জোগাড় করা, রাত দশটা নাগাদ ওরা খেতে বসে। রাত সাড়ে তিনটের সময় আবার শেহরি খাওয়ার জন্য গরম ভাত রেঁধে দেয়া। এখন যা তরকারি করে রাখবে, তা দিয়ে রাতের খাওয়াও হবে, শেহরিও হবে। বুটের ডাল তো আছেই, ডিমের ডালনা আর কলমি-শুষনির ঝোল। লতু আগে ভ্যান চালাত। এখন অটো চালায়। কদমগাছি-জাগুলে। লোন করে কেনা। দেওর বাবাজিকে ভ্যানটা দিয়েছিল চালাবার জন্য, উনি আবার নিজে ভ্যান চালাবে নি। পেস্টিজ। ভ্যান ভাড়া দেয়। মোবাইলে টাকা ভরার দোকান দিয়েছে ছোট, আর একজন নেতাবাবুর শাকরেদি করে, তা বাদে তাজ স্পোর্টিং কেলাবের কেউটে, হিহি, কেউকেটা। ও-ই তো মোবাইলে গান ভরে দেয়। ওর নাম শাকুর। একটুর জন্য শারুক হল না। ও শারুক খাঁ-এর ফ্যান। সায়িদাও তাই।

বাড়িতে ভিসিডি চালিয়ে দেখা হয়। দিলওয়ালে দেখা হল পরশুদিন। শ্বশুরমশাই দেখেও দেখে না। যখন ঝাড়পিট চলে, কিংবা মেয়েরা নাচে, কিংবা মদ খায়, শ্বশুরমশাই টেরিয়ে দেখে আর বিড়বিড় করে—কেয়ামত ইবার আসবেই আর দেরি নাই, সব আলামত দেখা যাচ্ছে। কান পেতি আছি কবে ইস্রাফিলের শিঙার আওয়াজ শুনব। উনি মানুষটা ভালো, কিন্তু একটু খ্যাপা খ্যাপা। সামান্য একটু জমি-জিরেত আছে, সেটাই দেখাশুনো করে। ভিটের পিছনের ডাঙ্গা জমিতে সবজি চাষ। শীতে কপি-মুলো, গরমে বেগুন-ঢেঁড়স, কুমড়ো। পটলের চাষ কক্ষুনো করে না। ওই যে বলে না, পটল তোলা? মানে তো মরে যাওয়া, ওই জন্য। খ্যাপা লোক আর কাকে বলে! শ্বশুরমশাইয়ের একটা মোটা খাতা আছে। ওর মধ্যে নিজে নিজে কীসব লেখে। খাতাটা আবার কুলঙ্গিতে কোরানের পাশে রাখে। তবে এক ঢাকায় ঢাকা রাখে না। কোরান লাল ভেলভেটের কাপড়ে ঢাকা, আর ওই খাতা সাদা কাপড়ে। শাশুড়ি আম্মা লতাপাতা নকশা করে মাঝখানে ৭৮৬ লিখে দিয়েছিলেন সুতোয় সুতোয়। ওর'ম দুটো আছে। কতবার পড়ে শুনিয়েছেন। যেমন—

আকাশভরা সূর্যতারা
বিশ্বভরা প্রাণ
যার হুকুমে চলে তিনিই
আল্লা মেহেরবান।

আকাশভরা সূর্যতারা তো রেডিয়ো-টিভিতে হয় খুব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরের লাইনটা আব্বুজির পছন্দ না। নিজের মতো করে লিখেছেন। অন্যরকমও আছে। এতবার পড়েছেন যে প্রায় মুখস্থই।

এই আসে কেয়ামত, হও সাবধান
মোমেন চেষ্টা কর রাখিতে ইমান।
বেহায়া হয়েছি মোরা আদম সন্তান
স্কন্ধে চাপিয়াছে ইবলিশ শয়তান
শয়তান সঙ্গে লয়ে করি যে আমোদ
হারামের দিকে চলি, ঘরে ঘরে মদ
নারীরা পুরুষ হয়, পুরুষেরা নারী
কেয়ামত আসিবেই খুব তাড়াতাড়ি

এক চক্ষু দজ্জাল হয়েছেন রাজা
ভেড়া করে দিয়েছেন লাখ লাখ প্রজা
ফেরেস্তা বধির হল নাহি শুনে কথা
ইবলিশ এসে বলে, কহ মন ব্যথা।
ফুলেতে খুসবু নাই দুধে নাই সর।
বর্ষায় বৃষ্টি নাই নদীখাতে চর।
ডাবে দেখ পানি নাই, গুড়ে না মিষ্টি।
আল্লাহতালা এইসব ধ্বংসিবে সৃষ্টি।
সব আলামত দেখি, যা আছে কিতাবে।
হে আল্লাহ, তৌফিক দেন সহিব কেমনে
আকাশ ফাটিয়া যাবে, নামিবে আগুন।
তথাপি আলম দার দিয়েছে ফাগুন।

আরও আছে অনেকটা। বলছে কেয়ামত যখন আসবে তখন আসবে, কিছু করার নেই। ততদিন শুদ্ধ মনে, ইমান রেখে এইসব এনজয় করো। ফাল্গুন, আমবকুল, কদমফুল, সব। খ্যাপাটে, সলমানের কী একটা সিনেমায় ছিল না। যো হোগা দেখ লেঙ্গে। ডরনা নেহি। ওই কোরানটা কিংবা এই খাতাটা ধরার অধিকার সায়িদার কেন, কারুর নেই। আব্বাজি যখন খাতাটায় লেখেন কিছু তার আগে একটু অজু করে নেন, কুলি করে নেন। আবার একাদশীর দিন উপোস থাকেন। এই উপোস রোজা রাখার মতো না। সন্ধের পর ইফতারির মতো খেয়ে নেন। নিরামিষ। শেহরি লাগে না। এতে নাকি বাত ভালো থাকে। রান্না ভালো হলে বলে, খুব স্বাদের হয়েছে, আলহামদুল্লিহ। এর মানে হল প্রশংসা আল্লার প্রাপ্য। সায়িদা ভাবে রান্না করলাম আমি, প্রশংসা আল্লার। আজও ওরকম আলহামদুল্লিহ বলবে। জম্পেশ করে হবে চিংড়ি-কলমি। শুষনি কলমি ল' ল' করে। রাজার বেটি পক্ষী মারে...। পুকুরপাড়ে নেমে নীচু হয়ে ছিঁড়ল কয়েক গাছা। কোঁচড়ে ভরল। আরও ক'টা। এবার আর না। ভরা পেটে পিছলে পড়লে বিপদ। পা-টা সুড়সুড় করে উঠল। কেঁচো? কী একটা সড়সড় করে চলে গেল। বেজি? পায়ে টনটন ভাব। দু-পা হাঁটার পর রক্ত। ব্যথাটা ওপরের দিকে উঠছে। গোড়ালির একটু ওপর থেকে রক্ত পড়ছে। ছুটল বাড়ির দিকে। তবু কোঁচড় ছাড়েনি। মাথা শিরশির করে উঠল। সাপ? সাপ কেটেছে, গাছপালা

ঘুরছে। গোধূলির আলো অন্ধকার। কলমি শুষনি ল' ল' করে। রাজার ব্যাটা পক্ষী মারে। উড়ল পক্ষী পড়ল বাজ। রাজার বেটি মরল আজ।

কখন ভুঁইয়ে পড়ে গেছে, সায়িদা জানে না।

দুই

বাড়িতে তখন সায়িদার শ্বশুর-শাশুড়ি ছাড়া কেউ ছিল না। একটা মোবাইল ছিল ঘরে, ওটা শাকুরের পুরোনোটা, সায়িদাকে দিয়ে দিয়েছে। কেউ মোবাইল চালাতে জানে না। খলিলা বিবি হে আল্লা বলে চেঁচায়। কাদের মিঞা ছুটে যায় ইমাম সাহেবের কাছে। ওদের বাড়ি থেকে পুকুরটা পিছনের দরজা দিয়ে কাছেই। তিন মিনিটের পথ। কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত আসতে পারেনি সায়িদা। ওকে এইভাবে আসতে দেখে একটি বালিকা খবরটা দেয়। তোমাদের বাড়ির বউ পড়ে গেছে, কাতরাচ্ছে। তখনই ছুটে যায় মেয়েটা। ওর কাকুদের খোঁজ করে। সব কাকুরাই তখন যে যার কাজে। কাছের মাঠে কাজ-করা দুজন ছুটে এল। দেখেই বলল—সাপে কেটেছে। ওঝা ডাকতি হবে। নিবারণ ওঝা! নিবারণ ওঝা! একজন বলে। এক সদ্য গোঁফ-ওঠা বালক বলে, ওঝা কী করবে! সাপে কেটেছে তো হাসপাতালে নে' চলো। শাকুরচাচা, লফিতচাচাকে খবর দিতে হবে। ফোন আছে? ছুটে গিয়ে মোবাইলটা নিয়ে আসে খলিলা। ফোনটা চালুই আছে। নম্বর? নম্বর তো জানা নেই। কে জানে নম্বর? যে পাঁচ-ছ'জন ছিল তাঁদের মধ্যে দু'জন বাদে সবাই বালক-বালিকা। ছেলেটি মোবাইল নিয়ে লতিফের নাম খোঁজে। লতিফ বলে কোনও নাম সেভ করা নেই। আগে এটা শাকুরের যখন ছিল দাদা বলে সেভ ছিল। সায়িদা ওটা কবে এডিট করে শাহরুক করে রেখেছে—বালক জানে না। আব্বাজান বলে যেটা সেভ আছে সেটা নিশ্চয়ই এই ভাবির বাবা। বাবাকেই জানিয়ে দেবে? তার আগে শাকুরভাই সেভ আছে কি না দেখতে লাগল। খলিলা বিবি উবু হয়ে সায়িদার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল, অ মেয়ে, লতিফের লম্বরটা বল ও রে বল। কথা ক'...।

সাদিয়ার ঠোঁট কেঁপে ওঠে।

কয়েকজন উল্লাসে বলে, জ্ঞান আছে, জ্ঞান আছে।

একটি বালক বলে সাইকেল নিয়ে বড় রাস্তায় চলে যাই, লতিফচাচার খোঁজ পেয়ে যাব। বালকটি শাকুরের নম্বর পেয়ে গেল। এবং ব্যাপারটা জানাল।

সায়িদা তখনও ভুঁইয়ে। ঘরে নেওয়া দরকার মনে হল খলিলার। কিন্তু এই বাচ্চারা কি পারবে? দু'হাত দুজন, দু'পা দুজন...। মাঠের কাজ করা দুই জোয়ান ব্যাটাছেলে সামনেই আছে। সায়িদার বুকের কাপড় ঠিক করে দেয়। হোক পরপুরুষ, তবু বলে, বউকে ঘরে নেব বাবা, দুজনে পা দুটো ধরো, আমরা হাত ধরি। ওদের একজন বলে, এভাবে হয় নাকি! একটা বিছানার চাদর নে' আসুন না। ওটাই শুইয়ে চারজন চারকোনা ধরতি হবে। পোড়ারমুখো মিনসে এসব না করি গেছে ইমাম ডাকতে। কী মানুষ নিয়ি ঘর করতি পাঠালে আল্লা...বিড়বিড় করতে করতে বিছানার চাদর নিয়ে আসে। ঘরে শুইয়ে দিয়ে বালকটি পায়ের দংশনের জায়গাটা দেখে। কইতে থাকে দুটো দাগ হবে বিষাক্ত, অনেকগুলি দাঁতের দাগ হলে বিষহীন। কিন্তু এই পায়ে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। গোড়ালির একটু ওপরে ছোবলটা পড়েছে। রক্ত এখনও গড়াচ্ছে। জল দিয়ে রক্তটা পরিষ্কার করে কিন্তু একাধিক দাগ দেখতে পায়। তবে কি নির্বিষ সাপই কামড়েছে? অনেক সময় ভয়েও এমন হয়। সবার আগে যেটা দরকার, একটা পাটের দড়ি জোগাড় করে ক্ষতস্থানের ফুটখানেক ওপরে বেঁধে দেয়। ইতিমধ্যে আরও লোকজন চলে এসেছে। বউ-ঝিরাও। শোরগোল শুরু হয়। কেউ বলে জাগিয়ে রাখতে হবে, ঘুমোলেই বিপদ, চিমটি কাটো, কেউ চোখের পাতা টেনে তোলে। একজন একটা শুকনো লঙ্কা দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে নাকের সামনে ধরে। সায়িদা মুখ নাড়ায়, ওই তো, ওই তো জ্ঞান আছে। কেউ চামচ দিয়ে জল খাওয়ায়। কেউ বলে—এত রক্ত পড়ছে যখন রক্তবোড়া। কেউ বলল ভুসোবোড়াও হতি পারে। একজন বলল ভুসো বোড়ায় এত রক্ত বেরয়? অন্য কেউ বলল—শামুক ভাঙাই হবে। পুকুরের দিকি গেছিল যে কালে...। একজন বলল ওঝা ডাকতি গেছে কেউ? ইতিমধ্যে গৃতকর্তা কাদের মিয়া এসে গেছে। সঙ্গে ইমাম সাহেব। ইমাম সাহেবের বাইক আছে। বাইকের পিছনে কাদের। কাদের প্রথমেই বলে, আছে তো, বেঁচি আছে তো?

আছে আছে আছে...।

ইমাম সাহেব মৌলবিও বটেন। মুখে লম্বা নুর, গোঁফ কামানো, পাজামা গোড়ালির ইঞ্চি খানেক ওপরে। মাথায় টুপি। বললেন বারান্দা থেকে সরো সব্বাই, ফাঁকা করো। ওদের বাড়ির সামনে বারান্দা। বারান্দায় গ্রিল লাগানোর ফ্রেম হয়েছে, কিন্তু গ্রিল বসেনি। তিনটে রুম, বারান্দাটা কেটে একপাশে রসুইঘর। টিনের ছাদ, ইটের দেওয়াল, পাকা মেঝে।

ইমাম সাহেব দোয়া পড়লেন। তারপর কাদেরকে বললেন মিঞা, দোয়া মাছুরা জানা আছে? জানা থাকলি পড়ো। কাদের পড়ল। এর মানে হে আল্লাহ, যে মৃত্যুমুখে পড়ে আছে তাকে ক্ষমা করো। মাছুরা পড়তে বলল কেন? ও কি তবে মরণাপন্ন? কাদের দোয়াপড়ার পর পুত্রবধূর ক্ষতস্থানে ফুঁ দিল।

ইমাম বলল, তুমি ফুঁ মারার কেডা? আল্লাহর কাছে দোয়া করেছ উনি যা করার করবেন। এইসব মুশরিকি করতি কে বলছে? আমি কখনও পানিপড়া তেলপড়া দিই না।

আমার কাজ আমরা করলাম এবার তোমার কাজ করো। হাসপাতালে যাও। ওঝাদের মন্তরে কিছু হয় না। এবার মোটরসাইকেল নিয়ে শাকুর চলে আসে। সায়িদার দেওর। আরও দুটো বাইক। পাঁচ-ছ'জন যুবক। ওরা তাজ স্পোর্টিং ক্লাবের। শাকুর পরিস্থিতিটা একবার দেখে নিল। কাকে যেন ফোনে বলে দিল ভাবিকে নিয়ে বারাসত সদর হাসপাতালে যাচ্ছি। একটু এমএলএ-কে বলুন ওই হাসপাতালে বলে দিতে, আমরা ওর লোক। যেন ঠিকঠাক হয়। যে যুবকগুলি এসেছে, সবাই ওদের মোবাইল নিয়ে বিভিন্নরকমভাবে ব্যস্ত। কেউ বলল, অ্যাই শালা বুচু, তোর অ্যাম্বুলেন্স কী হল! একজন মোবাইল বাগিয়ে শুয়ে থাকা সায়িদার ছবি তুলল। শাকুর ধমকাল—আর কতক্ষণ? রিজার্ভ যাবার দিন পেলি না। শাকুর বলল, রিজার্ভ নিয়ে যোগীর হাট গেছিল। ও আসছে। নয়াগ্রাম পৌঁছে গেছে, আর পাঁচ-সাত মিনিট। অ্যাম্বুলেন্স না এলে অটো করেই নিয়ে যাব। আমাদের ক্লাবে একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবই করব। টাকির দুটো অ্যাম্বুলেন্স। একটা খারাপ, অন্যটায় পেশেন্ট। হে আল্লা হে রব হে দয়াল ইত্যাদি অস্ফুট শব্দপুঞ্জর ভিতর লতিফ ঘরে ঢোকে। শাকুর বলে, কোনও কথা নয়। বারাসত। পিছন পিছন তিন-চারটে বাইক।

তিন

বারাসতে এভিএস মানে অ্যান্টিভেনাম সিরাম ছিল। একজন ডাক্তার বলল, ভালোরকমই বিষ ঢেলেছে। যতদূর মনে হয় বোড়া জাতীয় সাপ। চন্দ্রবোড়াও হতে পারে।

এধার থেকে একটা আওয়াজ এল—আমি তো আগেই বলে দিয়েছিলাম চন্দ্রবোড়াই হবে। ডাক্তার আবার বলল—একটা কথা বলার ছিল। আগে মা বাঁচুক, পরে সন্তান, আমরা এই লাইনে এগোচ্ছি।

লতিফ বলল, না-না, বিয়ের বাচ্চাও চাই, চার বছর পর।

কে একজন বলল—বাচ্চা নষ্ট করা চলবে না বলে দিলাম। যেভাবেই হোক দুজনকেই বাঁচাতে হবে। আমরা কিন্তু ননীদার লোক। কেউ ফোন করেনি?

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, ননীদা কে?

—ননীদাকে চেনেন না? ক'বছর বারাসতে চাকরি করছেন?

ডাক্তার বললেন, সরি। চিনি না। কেউ ফোন করুক আর না করুক, আমরা সবরকমভাবে চেষ্টা করব যেন দুজনই বাঁচে। আপনারা ভিতরে ভিড় করবেন না। বাইরে গিয়ে বসুন। পেশেন্টকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। একটু পরেই এভিএস দিয়ে দেব।

এভিএসটা কী? একজন জিজ্ঞাসা করল। ডাক্তারবাবু বললেন, পরে বলে দেব।

বাইরে সাত-আটজন। বাড়িতে বাপ-মা। ফোনে খবর দিচ্ছে। ওরা ফোন এলে কোনটা টিপে কথা বলতে হয়, আর কোনটা টিপে কথা বন্ধ করতে হয়, তা জানে। ফোনে জানিয়ে দিচ্ছে ওরা। সদ্য গোঁফ ওঠা তরুণ ছেলেটির নাম হায়দার। ও স্কুলে হায়দার আলি নামে নথিবদ্ধ হলেও বাংলাদেশি কায়দায় ও নিজের নাম লেখে হায়দার বিক্রম। আরবিতে হায়দার মানে সিংহ। স্কুলে ওকে অনেকে বিক্রম নামেও ডাকে। ও বলল এভিএসটা কি জিনিস বলব? ওটা হল একটা জানোয়ারের শরীরে অল্প করে সাপের বিষ ঢোকানো হয়। এই বিষকে বলে ভেনাম। এবার সেই জানোয়ারের রক্তের ভিতরেই ওই বিষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। তারপর শরীরই কতকগুলো উপাদান তৈরি করে নেয়, যা বিষের দোষগুলো কাটাতে পারে। সেই রক্তরসকে বলে অ্যান্টিভেনাম সিরাম। রক্তরসকে ইংরেজিতে বলে সিরাম।

কে একজন বলল, শুয়োরের রক্ত দেয় না তো?

ওর থুতনিতে দাড়ি।

হায়দার বলে, না না, শুয়োরের না। ঘোড়ার কিংবা ভেড়ার।

লোকটা বলে, তবে ঠিক আছে।

হায়দার লেখাপড়ায় ভালো। সায়িদাদের প্রতিবেশী। স্কুলে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়।

যে ডাক্তারটি চিকিৎসার দায়িত্বে, ওর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গ্রামের হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। সাপে কাটা রোগীও পেয়েছেন বেশ কিছু। পুরুষ, বৃদ্ধা, বালিকা, এরকম আটমাসের গর্ভবতী পাননি। গর্ভবতী মহিলাকে এভিএস দিলে কী পরিণতি হতে পারে, এ নিয়ে দুজন সিনিয়ার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একজন বলেছিলেন—গর্ভবতীদের ভ্যাকসিন দেওয়া যায়, কিন্তু সিরাম দিলে বাচ্চাটার অ্যানাফিলেকটিক শক হয়ে যেতে পারে। অন্যজন বলল—দেওয়া যেতেই পারে। তবে রোগী যদি স্টেডি থাকে, তাহলে সিন্টো চার্চ করে আগে বাচ্চাটা ডেলিভারি করে নেওয়াই ভালো। সিন্টোসিনন একটা ড্রাগ। এটা শরীরে ঢুকিয়ে দিলে প্রসব বেদনা হয়। এবং প্রসবও হয়ে যায়।

সিন্টোসিননকে ডাক্তারবাবু ছোট করে সিন্টো বলে। ডাক্তারবাবুটি সংকটে পড়েন। উভয় সংকট। রোগীকে এখনও দু-তিন ঘণ্টা এভিএস না দিয়ে প্রসব করানো কি ঠিক হবে? ইতিমধ্যেই ঘণ্টা তিনেক কেটে গেছে।

ডাক্তারটির নাম সুবিমল আচার্য। একটু ধার্মিক প্রকৃতির লোক। ঠাকুর-দেবতায় আস্থা আছে। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে সিরিঞ্জে করে স্যালাইনের বোতলে এভিএস ঠুসে দিলেন। এবার এভিএস মেশানো স্যালাইন মেয়েটার শরীরে ঢুকছে। দুর্গা দুর্গা। যেন ভালো হয়ে যায়। বাইরের সব সুবিধের নয়। ডাক্তাররা প্রায়ই মারধর খাচ্ছে।

রাত্তির দশটা নাগাদ ডাক্তার আচার্য বের হলেন। শাকুর বলল, কী ডাক্তারবাবু, বাড়ি যাচ্ছেন? ডাক্তার আচার্য বললেন, হ্যাঁ, সকাল সাড়ে ন'টায় এসেছিলাম। যখন ফিরব, তখনই তো এই পেশেন্ট এল।

—রাত্তিরে কিন্তু এধার-ওধার হলে?

—অন্য ডাক্তারবাবুরা আছেন। সব বলা আছে। সেরকম হলে ওরা আমাকে ফোন করবে।

—আপনার ফোন নম্বরটা দিয়ে যান। কড়া গলায় প্রায় হুকুম।

আচার্য মুহূর্তের জন্য ভাবলেন নম্বর দেবেন কি না। দেব না বলা যাবে না। ভুল নম্বর দিয়ে দেবেন? সেই ভুল নম্বরে যদি এখনই আবার করে? ঠিক নম্বরটাই দিলেন। লতিফ বলল, বাচ্চাটাকে ঠিকঠাক পাব তো ডাক্তারবাবু? ওর কণ্ঠে অসহায়তা, মিনতিও। বলল—চার বছর বিয়ে হয়েছে ডাক্তারবাবু, বাচ্চা হয়নি, সেই তেহট্টে গিয়ে পিরের পুকুরে চান করিয়ে আনলাম, তারপর...।

সুবিমল বলল, সবই ওপরওয়ালার হাত।

রাত্রে শাকুর আর লতিফ হাসপাতালে ছিল, বাকি সবাই ফিরে গেল বাড়ি। মাঝে দু'বার ওপরে দেখতে গিয়েছিল। সায়িদা শুয়ে আছে। নাকে অক্সিজেন, হাত দিয়ে ঢুকছে উপুড় করা বোতলের স্যালাইন। নার্সদের ঘরে ঘুমন্ত নার্স। শাকুর বলল আমাদের রোগী কেমন আছে? নার্স বলল, ভালো ভালো।

ভোরবেলা দু ভাই বাড়ি গেল, ফিরল সকালবেলার কাজকর্ম করে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে। খোঁজ নিতে গেল। শুনল, কন্ডিশন একইরকম।

একইরকম কেন? এতক্ষণে তো কিছুটা ভালো হয়ে যাবার কথা। ডাক্তারবাবু কোথায়? রাত্তিরের ডিউটির ডাক্তার রাউন্ডে ছিল। সে এল। শাকুর বলল, কালকের ডাক্তারবাবু কোথায়? এই ডাক্তার বলল—ওনার এখন ডিউটি নেই।

ডিউটি নেই বললেই হল?

ফোন লাগাল শাকুর।

—কী হল? কাল রাত্রে নার্স বলল ভালো। অথচ এখনও চোখ চায়নি।

—.....

—তো, আপনি কখন আসবেন?

—.....

—ওসব ডিউটি ফিউটি রাখুন তো, একটা সাপে কাটা পেশেন্ট। অথচ...

—.....

—এই জন্য, অ্যাই জন্য হাসপাতাল টাসপাতাল ভাঙচুর হয়। যদি কিছু হয়ে যায়....

—.....

—শালা ডাক্তার ফোনটা ছেড়ে দিল।

শাকুর অন্যদের বলল।

কেউ একজন বলল, নাড়ুদাকে একটা ফোন লাগাই। অন্য একজন বলল—ননীদাকে বলা আছে না? ননীদা নিশ্চয়ই অ্যাকশন নেয়নি। নইলে পিকচার আলাদা হত। কাউকে বিশ্বাস নেই শালা।

এমন সময় ওদের ভিতরে ডাকল। যে-কোনও দুজন আসবেন।

সকালে যে ডাক্তার ছিলেন উনি বললেন, আমরা রেফার করে দিচ্ছি, মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। আমরা যা করার করে দিয়েছি। এখন এখানে রাখায় বিপদ আছে। ডায়ালিসিসের দরকার হতে পারে। ভেন্টিলেশনও। সমবেত লোকজনের একজন বলল—এখানে তো জানালা-টানালা ভালোই আছে...। ভেন্টিলেশন বলতে ওরা তো এটুকুই বোঝে।

লতিফ বলে—অবস্থা কি ভালো নয়?

ডাক্তারবাবু বলেন—ভালো বলা যায় না। খুব খারাপও নয়। যে বিষটা ঢুকেছে, এটা রক্তকে নষ্ট করে দেয়। এতে নানারকম সমস্যা হয়। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। শাকুর বলে—মেডিকেল যদি বলে সিট নেই, ফেরত দেয়?

ডাক্তার বলেন—সিট না থাকলেও ফেরত পাঠাবে না। হাসপাতালের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স কী সব অসুবিধার কথা বলল। সময় নষ্ট করা যাবে না। একটা অ্যাম্বুলেন্স এল, সারা গায়ে অনেক অক্ষর। ক্লাবের নাম—খামখেয়ালি সংঘ। দুপাশে সাংসাদ অমুকের বদান্যতায় রোগীদের পাশে দাঁড়াবার জন্য...। ধূমপান বর্জন করুন। ওখানে ঢোকানো হল। স্ট্রেচারে করে যারা এনেছিল ওরা বকশিসের

জন্য দাঁড়িয়ে রইল। শাকুর বলল, আমরা ননীদার লোক। ড্রাইভার বোধ হয় অবাঙালি। ও জানতে চাইল—মাটিয়া কলেজ?

অ্যাম্বুলেন্স একটা অদ্ভুত ভয়-ভয় শব্দে নিজেকে জাহির করতে করতে চলে। ওই একইরকম হর্ন মন্ত্রীর পাইলটকারেও বাজে। তখন ওই শব্দটাকে রংবাজি সাউন্ড মনে হয়। মন্ত্রীর গাড়িতে কখনও বসেনি শাকুর। অ্যাম্বুলেন্সে বসল। সেই একই শব্দ।

কলকাতার মেডিকেল কলেজে কাকে দিয়ে সেটিং করাবে? ওরা বারাসত পর্যন্ত পারে। কিন্তু কলকাতার হাসপাতালে হাইফাই ব্যাপার। ওখানে ডাক্তাররাও হাইফাই। ননীদা নাড়ুদারা র‍্যালা দেয়, বলে মিনিস্টার লেবেল পর্যন্ত কানেকশান আছে, সব ফালতু। ডিএমকে কিছু বলতে গেলে প্যান্ট খারাপ হয়ে যায়। তবু কাকেই বা বলবে? একজন বলল—শুনেছি বাসস্ট্যান্ডের গোবিন্দ, যার চায়ের দোকান, ওর মেয়ে নার্স। পতা লাগাতে হবে।

মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সির সামনে কয়েকজন চোখের তলাফুলো লোক। কী কেস? স্ট্রেচার চাই? এসব প্রশ্ন। শাকুর বুঝে যায় এরা কারা। অ্যাম্বুলেন্সের স্ট্রেচারেই ওরা সোজা বয়ে নিয়ে গেল এমার্জেন্সির ভিতরে। কচি ডাক্তার দুজন। এরা কী বুঝবে? কিন্তু ওরা অন্য একজন ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। উনি বললেন এক্ষুনি বেডে দিয়ে দিচ্ছি। যা কাগজপত্র আছে দিন।

চার

বেড খালি নেই। মেঝেতে শুইয়ে দিতে হল। মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে যিনি ছিলেন, তার নাম ডাক্তার অংশুমান তালুকদার। কাগজপত্র দেখে মনে হল আগে যা চিকিৎসা হয়েছে ঠিকমতোই হয়েছে। বাইটের দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই এভিএস পড়ে গেছে। ওর জ্ঞান হারানোটা ভয়ের। এরকম শক অনেকেরই হয়। সাপে কাটা রোগী বেশ কিছু পেয়েছিলেন বাঁকুড়ায় যখন পোস্টিং ছিল। সাপে কাটলে নানারকম উপসর্গ হয়, যা বইতে থাকে না।

একটি বছর দুয়ের বাচ্চার কথা মনে এল। ওর মা দুপুরের দিকে নিয়ে এসেছিল কোলে করে। বাচ্চাটার পায়ের বুড়ো আঙুলে সামান্য রক্ত চোঁয়াচ্ছে। ওর মা দুব্বো ঘাস, গাঁদা ফুলের পাতার রস দিয়েছে, রক্ত পড়ছে তবু। কীসের কামড় ওরা জানে না। ছুঁচো না কোনও পোকা কিছু বলতে পারছে না, বাচ্চাটা উঠোনে খেলছিল। বাচ্চাটা দিব্যি কথা বলছিল, অক্সিজেন সিলিন্ডার কিংবা ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্রর দিকে তাকিয়ে এটা কী ওটা কী করছিল। অরুণাংশু অ্যান্টিসেপটিক লোশনে ছোট ক্ষতটা মুছে

ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে একবার বমি করল, তখন দেখল গোড়ালির কাছে একটা ফোসকা। বিকেলে আরও দু-তিনটে ফোসকা। যাকে ইংরেজিতে বলে ব্লিস্টার। এটা কি এলার্জি? পোকা বা ইঁদুরের কোনও বাইট থেকে? অ্যান্টি এলার্জিক কিছু দিল। কোয়ার্টার থেকে রাত আটটা নাগাদ দেখতে এল। দেখল ফোসকার সংখ্যা বেড়েছে। বাচ্চাটা একটু নিস্তেজ, কিন্তু কথা বলছে। ব্যান্ডেজে রক্ত। তার মানে রক্ত চোঁয়াচ্ছে? তার মানে কি জমাট বাঁধছে না? তার মানে হেমাটোটক্সিক বিষ? তবে কি সাপ? ওদিকে চিতি সাপের উৎপাত আছে। ব্লকের ওই হাসপাতাল থেকে বাঁকুড়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাটাকে রাখতে পারেননি। পরদিন দুপুরে মারা গিয়েছিল। ফোসকা যে একটা সাপ কাটার উপসর্গ হতে পারে সেটা টক্সিকোলজির কোনও বইতেই পায়নি। অনেক পরে একটা বই পড়ে জেনেছে একই সাপের বিষে অঞ্চলভেদে কিছু আলাদা এনজাইম থাকতে পারে এবং বিভিন্ন শরীরে আলাদারকম উপসর্গ হতে পারে। যা যা উপসর্গ আছে তার মধ্যে ব্লিস্টার ফর্মেশন বা ফোসকা পড়াও ছিল।

আসলে ভারতে ডাক্তারির সিলেবাসটা বানিয়েছিল ইংরেজরা। ওদের দেশের রীতি এবং অসুখ-বিসুখগুলো সামনে রেখেই তো সিলেবাস বানানো হয়েছিল, স্বাধীনতার বহু বছর পরেও জ্বর হলে বার্লি পথ্য দেওয়া হত। কারণ ওদের দেশে চাল হয় না, বার্লি হয়। আজকাল ডাক্তারবাবুরা বলেন পাতলা করে খিচুড়ি খেতে পারেন। ইউরোপের ঠান্ডা দেশগুলোতে সাপের উপদ্রব নেই। সিলেবাসে সাপে কাটার চিকিৎসাও ছিল না। অনেক পরে কিছুটা ঢোকানো হয়েছে। আসলে সাহেবরা গুরুত্ব দেয়নি বলে পরবর্তীকালেও গুরুত্ব পায়নি।

পেশেন্ট পার্টি চার-পাঁচ জন। একজনের একটু হোমরা-চোমরা ভাব আছে। নীচে শোয়ানো হয়েছিল বলে গজগজ করছিল। বেড নেই কেন? একজন মন্ত্রী এমএলএ ফোন করলেই তো সুড়সুড় করে বেড হয়ে যায়। তখন খালি হয় কী করে?

অংশুমান বলেছিলেন, তবে কি বেড নেই বলে ফিরিয়ে দিলেই ভালো হতো? বেড ফাঁকা হলেই দিয়ে দেওয়া হবে।

ছেলেটা ফোন বার করে কাকে যেন বলল, দেয়নি, বেড দেয়নি। হেড? শাকুর জিজ্ঞাসা করে, এই হাসপাতালের হেড কে আছে? অংশুমান বলেন, সুপার।

সুপারের নাম কী?

অংশুমান ইচ্ছে করলে বলতে পারতেন জানি না যান। কিন্তু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রুগি দেখতে হবে। সুপারের নাম বলেন,। আর বলেন, নীচে যান। অপেক্ষা করুন। তবে একটা কথা, বোড়া জাতীয় সাপ কামড়েছে, নানারকম সমস্যা হয়। আমরা চেষ্টা করব। আমাদের ওপর আস্থা রাখুন। তবে বলে রাখা উচিত, অনেক সময় হঠাৎ করে কিছু হয়ে যেতেও পারে।

পেশেন্ট পার্টির আর একজন ছিল। ও নিশ্চয়ই মেয়েটির স্বামী। হাত জোড় করে বলল, ডাক্তারবাবু, পেটের বাচ্চাটা যেন...কান্নায় গলা ভেঙে যায় লোকটার।

অংশুমান মেয়েটিকে দেখেন। জ্ঞান আছে। বলেন, ভয় নেই বোন। কিচ্ছু ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। অংশুমান বোঝেন ভয় তাড়ানোটাই প্রাথমিক চিকিৎসা। মেয়েটি পেটে হাত দিতে চায়। হাতটা নড়ে ওঠে। পেট পর্যন্ত যায় না। হতে পারে মেয়েলি লজ্জায়। বলে, বাচ্চাটা কি?...

অংশুমান দেখে মেয়েটির মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। অংশুমান একটু সামনে যেতেই সায়িদা পেটে হাত দিয়ে দেখল ধুকপুকি আছে কি না। অংশুমান এটা লক্ষ করেন। অংশুমান আবার আসেন। বলেন—শুনিয়ে দিচ্ছি। স্টেথোস্কোপটা সায়িদার কানে লাগান, আর বাচ্চার স্পন্দন শোনান। কী আশ্চর্য এক প্রশান্তি ফুটে ওঠে মেয়েটার মুখে। যেন জ্যৈষ্ঠর মাঠে মেঘের ছায়া। এইটুকু আনন্দ তো একজন ডাক্তার দিতেই পারে। অংশুমানের দায়িত্বে তো এই মেয়েটিই শুধু নেই, আরও তো বেশ কয়েকজন। সংকটাপন্ন রোগীও আছে দু'জন।

অংশুমান ওঁর কর্তব্য-কর্ম ছকে নিয়েছেন। দ্রুত রক্ত, প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। ইসিজি করিয়ে নিতে হবে। নেফ্রোলজিস্ট দেখাতে হবে, কার্ডিওলজিস্ট দেখাতে হবে।

বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে বোঝা গেল সাপের বিষ রক্তকে অনেকটাই ভেঙে দিয়েছে। হিমোগ্লোবিন কমে গেছে অনেকটাই। রক্তের ভাঙা কণিকাগুলিকে বের করতে পারছে না কিডনি। কিডনি নিজের কাজ করতে পারছে না। ডায়ালিসিস দরকার এবং এর পরে দরকার হবে প্লাজমা। অনেকটাই দরকার হতে পারে। এটাও জানা ছিল যে এখন ব্লাড ব্যাংকের রক্তভাণ্ডারের অবস্থা ভালো নয়। গ্রীষ্মকালে এই সংকটটা চলে। তাছাড়া কিছুদিনের মধ্যে এতগুলো মারামারিজনিত রক্তপাত হয়ে গেছে যে রক্ত রাস্তায় ধুলোয় পড়ে নষ্ট হয়েছে, বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকের সঞ্চয় থেকেই তো এই রক্ত আহত শরীরগুলোতে গেছে।

অংশুমান ডাক্তার হয়েও শিউরে ওঠেন ছবিগুলো দেখে। খবর কাগজের সাদা-কালো ছবিতে ততটা শক হয় না, ফেসবুকের রঙিন ছবিতেই সেই বিচ্ছিরি অনুভূতিটা হয়। চাপাতি দিয়ে গলায়...।

বাংলাদেশে পুরোহিতরা...যাজক... তরুণ ছেলেগুলো যারা ব্লগে নিজেদের চিন্তা জানিয়েছিল, জমাট রক্তপিণ্ডের ভিতরে ফুটপাথে ওরা। বোমায় উড়ে যাচ্ছে শরীর, রক্তফোয়ারা। এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, পিচকিরির মতো রক্ত। ধর্মের নামে।

অংশুমান হিপোক্রিটেসের শপথ নিয়েছে ডাক্তারি পাশ করার সময়। মানুষকে মারা নয়, বাঁচানোটাই ধর্ম।

অংশুমানের হাউস স্টাফ পেশেন্ট পার্টিকে বলে, রক্তের দরকার হবে। আপনারা যতজন পারেন রক্ত দান করুন, আপনাদের দান করা রক্তের পরিবর্তে আমরা ওর জন্য রক্ত পেয়ে যাব।

কে একজন বলল, এটা তো রমজান মাস, রোজা রাখছি, এখন রক্ত...মানে ধর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে না...!

পাঁচ

তিন দিন কেটে গেল। গাঁয়ের লোকজন গতকাল আসেনি কেউ। লতিফ আছে, আর শাকুরও এসেছিল। আজ শাকুরও আসেনি। কামধান্দা ফেলে রোজ এলে কি চলে! সায়িদার বাপের বাড়ির লোকজনও ছিল গত দু'দিন। আজ কেউ নেই। লতিফ একাই। বেলা দশটা থেকে এগোরোটা ওপরে যেতে দেয়।

নার্স দিদিদের সঙ্গে দেখা করে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলে বলে ডাক্তারবাবুরা বলবে। বড় ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে কই? সন্ধের সময় ছোট ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলা যায়। গতকাল ছোট ডাক্তারবাবুরা বলল দুই-একদিনের মধ্যেই ডেলিভারি করিয়ে দেবে।

কতক্ষণ আর হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে থাকা যায়? রাস্তায় বের হয়। হাসপাতালের উলটো দিকে একটা মন্দির। ওখানে ঘণ্টা আছে। ঘণ্টার আওয়াজ হাসপাতালের সিঁড়িতে বসেও শোনা যায়। মন্দিরের সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াল লতিফ। ঘণ্টা নেড়ে কি মনোবাঞ্ছা জানাতে হয়? কেউ কেউ ঘণ্টা বাজাচ্ছে। না, এটা রোজার মাস। রোজাটা ঠিকমতো রাখলে সওয়াব হয়। রোজাদারদের প্রার্থনা পরমেশ্বর কবুল করেন। হঠাৎই বিড়বিড় করে বলল—বাচ্চাটা যেন সুস্থভাবে, ঠিকঠাক...যেন তাগতদার হয়। তারপর ঠং করে একবার ঘণ্টাটা বাজিয়ে ওখানে দাঁড়াল না আর।

ট্রাম যাচ্ছে ঘড়ঘড়। বুকের মধ্যে কী যেন ছেঁচড়ে যাচ্ছে। কী একটা যেন, শুকনো পাতা, নাকি গিরগিটি। কার কাছে ফরিয়াদ জানাল ঘণ্টা নেড়ে?

পরমেশ্বর, মালিক, প্রভুর কাছে বান্দার ফরিয়াদ।

ঘণ্টা নাড়ল কেন?

ঘণ্টা তো এমনি। একটা শব্দ। ঠিক আছে?

ঘণ্টার ওধারে কী ছিল।

ঈশ্বর।

একটা মূর্তি ছিল না?

দেখিনি। তবে ঈশ্বর তো সব কিছুতেই...

ভক্ত পেল্লাদের মতন কথা কইচিস যে...।

আমিও তো ভক্ত পেল্লাদের মতোই।

ঠিক আছে। কাউকে বলিস না।

আচ্ছা।

তবে তুই তাগতদার বাচ্চাটাই চাইলি যে বড়? তোর বউকে চাইলি না? তোর বউ যেন ঠিকঠাক ফিরে আসে তোর ঘরে, তেমন দোয়া করলি না তো...।

নিজের সঙ্গে কথা বলছিস লতিফ। সত্যিই তো। সায়িদার জন্য দোয়া করল না কেন? মনের ভিতরে কি এমন কিছু ছিল, টায়ারের ভিতরের টিউবের চোরা লিক যেমন থাকে, যে বউ গেলে আবার বিয়ে করা যাবে, কিন্তু নিজের প্রথম সন্তান... কাঁঠালে বসা মাছি তাড়াবার মতো মন থেকে তাড়ায় এটা। এরকম ভাবনা ঠিক নয়, অন্তত এই রমজান মাসে। রোজ রাতে তো এশার নামাজের পর আল্লাহপাকের কাছে মোনাজাতের সময়ে বলে আমার সায়িদা বিবি বড় ভালো, ওকে রহম করো, ওকে ভালো করে দাও...। বলে তো। নামাজটা ঠিকমতো আদায় করা হয় না। ক'টা অটোওয়ালা-রিকশাওয়ালা পাঁচবার নামাজ পড়তে পারে? তবে রমজান মাসে লতিফ পাঁচবারই পড়ে।

সন্ধের সময় ছোট ডাক্তারবাবুরা বলল কাল ডেলিভারি করানো হবে। একটা সিন্টোচার্জ করে, মানে ইনজেকশন দিয়ে আর্টিফিসিয়াল লেবার পেইন দিয়ে নর্মাল ডেলিভারি করে বাচ্চা তুলে নেবে, নইলে সিজার করতে হবে। রক্ত দরকার হতে পারে। লোক রেডি রাখতে হবে।

বাঙালির ছেলে বাংলা বললেই তো পারিস। ডাক্তার পড়লেই কি ইংলিশ ঝাড়তে হয়? লতিফ ইংরেজি জানে না এমন নয়। মাধ্যমিক পাশ তো দিয়েছিল। তবে মোদ্দা কথাটা বুঝতে পেরেছে। ইনজেকশন

মেরে জোর করে ‘অরজিনাল’ ডেলিভারি করিয়ে দেওয়ার ট্রাই নেবে। না হলে অপারেশন করে বাচ্চা খালাস করে দেবে, তারপর সায়িদাকে আরও কীসব করবে বিষ লাবানোর জন্য।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। তখন হুজুরদের পাওয়া যায় না। সকালে ফজরের নামাজের সময় মসজিদে গেল। এই গাঁয়ে ক’জনই বা তেমন আলেম লোক আছে! ইমাম বলল—আল্লাহপাক তাঁর উম্মতের শরীরী যা রক্ত দেছেন সিটা নিজির মর্জিমতো খরচ করা যায় না। লতিফ মনে মনে প্রশ্ন করে তবে কি নিজের হাতে অন্যের রক্তটা নেওয়া যায়? জেহাদিরা ধর্মের কথা বলে অন্যের রক্ত নিচ্ছে যে...! মনে মনেই। মুখে বলে না। কিন্তু অন্য একটা যুক্তি শোল মাছের মতো ঘাই মারে। তবে হুজুর, রক্ত থেকেই তো মাতৃদুগ্ধ। মা কি তাঁর সন্তানকে দুধ দান করবে না?

ইমাম বললেন আল্লাহ মায়ের বুকে দুধ দেছেন সন্তানের জন্য, আর রক্ত নিজির জন্য। এবার লতিফ নয়, অন্য আরেকজন বলে—তবে বাচার যদি অ্যাকসিডেন হয়, রক্ত দরকার হয়, বাপ-মা দেবে না?

এ প্রশ্ন এখন ওঠে কেন? ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

লতিফ বলে, আমার স্তিরির লাগবে। অনেক। শুধু আমার দিলি হবে না, আমার গাঁয়ের লোকদেরও দিতি হবে।

লতিফ ‘স্ত্রী’ কথাটা যে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে না এমন নয়। কিন্তু ইমাম সাহেবের সামনে এত শুদ্ধ উচ্চারণ ‘আদব’ নায়। বিবিও বলা যায় না। সম্মানীয়দের বউ বিবি হয়। সাধারণ লোকের বউ পরিবার। স্তিরি বা ইস্ত্রিও চলতে পারে।

ইমাম সাহেব বললেন—আল্লাহ কেমন রাখিছেন তারে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ওরজন্য দোয়া করি আমি। এতদিন যখন জিন্দা আছে, আরাম হয়ে যাবানে। দাঁড়াও ফয়সলা দিচ্ছি। লম্বা পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলেন ইমাম সাহেব। কাকে যেন ফোন করলেন। দু-একটা আয়াত আদান-প্রদান হয়। তারপর বললেন—শোনো লতিফ, জায়েজ। চলবে। রক্তদান জায়জ আছে। তোমরা রক্ত দিতে পারো। তোমার পরিবার ফিরি আসবে ইনসাল্লা। ফিরি এলি ভালো করে ফিতরা দিয়ে দিও।

—তা আর বলতি? সে তো মনেই রেখেছি।

—তাছাড়া মসজিদের অজুর জায়গাটা টাইল বসায়ে দেব। ঝকঝকা থাকবে।

ওরা দু'ভাই আর লতিফের দুই শ্যালক সকাল দশটার মধ্যেই হাসপাতালে পৌঁছে গেল। শুনল ইনজেকশন দেওয়া হবে এক্ষুনি। ডাক্তারবাবুরা এসে গেছেন। ওরা লেবার রুমের বাইরে বারান্দায়। বুক দুরু দুরু। আল্লা নাম...।

দেড়টা নাগাদ হাসতে হাসতে নার্স এল একজন। সায়িদা বিবির স্বামী আছেন এখানে? লতিফ উঠে দাঁড়ায়। হাসছে যখন জিন্দা বাচ্চাই হয়েছে।

—কী বাচ্চা চেয়েছিলেন? ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে-মেয়ে সমান। ওপরওয়ালা যা দেবেন।

—ছেলে হয়েছে। মা, বেবি দুজনেই ঠিক আছে।

নার্সকে হুরি মনে হল। হুরি না, ফেরেস্তা।

লতিফ সবাইকে বলল, চলো, মিষ্টি খাই। ভুলেই গিয়েছিল এটা রোজার মাস।

অদ্ভুত একটা ঘণ্টা বাজছে বাইরে, মনের ভিতরে।

বাড়িতে ফোন করে। মাকে বলা ছিল। লতিফ বলে মা উলু দাও গো, তোমার নাতি হয়েছে। ফোনে উলুর শব্দ শোনে। মন্দিরের ঘণ্টায় উলুর শব্দ মেশে।

আজ রামজান মাসের বারো তারিখ।

লতিফের বড় শ্যালক বলল—বারো তারিখ খুব পয়া দিন।

রবিয়াল আওয়ালের বারো তারিখ নবি রাসুলের জন্ম। তাছাড়া আজ ফ্রাইডে। জুম্মাবার। কথায় আছে—জুম্মাবারে সওয়াবি, ছেলের টাকায় নবাবি। জুম্মাবারে জন্মালে ছেলের খুব পুণ্য হয়। আর রোজগেরে হয়। ছেলের টাকায় বাপ নবাবি করে।

লতিফের কি এত ভালো নসিব? সব কাজে বাধাই পেয়েছে জীবনে। জীবনের চলর পথে বারবার বাম্পার। অথচ রমজান মাসের জুম্মাবারে জন্ম নিল ওর ছেলে, তার ওপর আবার বারো তারিখ। বারো তারিখের ব্যাপারটা জানত না লতিফ। বড়শালাটা এসব অনেক কিছু জানে। লতিফ ভাবে ছেলের নাম রাখবে আয়মন। ও জানে আয়মন মানে পুণ্যবান।

সেই ডাক্তারবাবুটা, বড় ডাক্তার, লেবার রুমে ঢুকলেন। তিন-চার মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন, কথা আছে। সায়িদা বিবির এমনিতেই অ্যানিমিয়া ছিল মানে রক্তে হিমোগ্লোবিন কম ছিল। ওই জিনিসটার অনেক রকম কাজ। বিষে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং রক্ত দিতে হবে।

অলরেডি দু'বোতল দেওয়া হয়ে গেছে। এছাড়া প্লাজমা দিতে হবে। প্লাজমা মানে হল রক্তরস। রক্তের পরিবর্তে ব্লাড ব্যাংক থেকে পাওয়া যাবে। ক'জন রক্ত দিতে রেডি আছেন?

লতিফ আর শাকুর দেবে। সায়িদার দু'ভাই এসেছে। বড় ভাই যে বলেছিল ওর ভাগনে পুণ্যবান, সে বলল ওর মাথা ঘোরে। দুর্বল কিনা...মানে দেবে না।

লতিফ তিনটে আঙুল দেখায়।

ডাক্তারবাবু বলেন—তিনজনে কী হবে? অন্তত কুড়িজন চাই, যাঁরা একবার একবার করে দেবে। পাড়া-প্রতিবেশী ক্লাব নেই? লোক জোগাড় করুন। কালই। আজ তিনজনই দিয়ে দিন।

ওরা রক্ত দেয়নি কোনও দিন। কোনও ধারণা নেই কতটা রক্ত নেয়। ডাক্তারবাবুরা একটা হাসপাতালের কাগজ দিয়ে বললেন, ব্লাড ব্যাংকে চলে যান।

ছয়

প্রফেসর অংশুমান তালুকদার পড়ানও। ওঁর মেডিসিনের ক্লাসে ছাত্রদের বললেন—তোমার হিপোক্রেটিস ওথ নেবে কিছুদিন পরই।

যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও সাড়ে চারশো বছর আগে জন্মেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, তোমার রোগীকে তোমার আত্মীয়ের মতো দেখবে। বলেছিলেন, শিক্ষকের কথা শুনবে।

আমি তোমাদের শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকদেরও শিক্ষক, সবার শিক্ষক আইনস্টাইনের একটা কথা আছে, যার মূল কথা হল, প্রাচীনকালে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের শরীরের আচ্ছাদন তৈরি করে নিতে হত, খাবার জোগাড় করতে হত। আত্মরক্ষা করতে হত। এখন আমাদের পোশাক অন্যরা তৈরি করে দেয়। আমাদের খাদ্য অন্যরা উৎপাদন করে। আমাদের আরামের সামগ্রী যেমন চেয়ার, টেবিল, খাট, হিটারটাও অন্যরা বানিয়ে দেয়। লেখার কাগজ, কালি, কলমও আমরা নিজেরা তৈরি করি না। আমরা সমাজের থেকে নিই। সুতরাং আমাদেরও কর্তব্য আছে সমাজের প্রতি। যেহেতু আমরা ঋণী। ঋণ ফেরানোর জন্য আমাদের নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে। এটাই এ সময়ের মানবধর্ম।

আমার বেড-এ একটা স্নেক বাইটের পেশেন্ট আছে। হেমাটোটক্সিক পয়জন। সুতরাং বুঝতেই পারছ প্রচুর ব্লাড ও ফ্রেশ প্লাজমা দরকার। এখন ব্লাডের ক্রাইসিস আছে। পেশেন্ট পার্টি ব্লাড ডোনার জোগাড় করতে পারেনি। পেশেন্টটাকে বাঁচাতে হবে। তোমাদের মধ্যে কে কে ভলেন্টিয়ার হতে চাও? একবার করে ব্লাড ডোনেট করবে...। আমিও দিচ্ছি...।

প্রথমেই তিনটে হাত উঠল। তারপর আরও ছ-সাতটা। কয়েকটা হাতও অর্ধেক উঠে থেমে রইল। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে বলা যায় সবগুলো হাতই উঠে গেল। অংশুমান আগেই ওঁর এন্টর্নি এবং হাউস স্টাফদেরও একই কথা বলেছিলেন। সেই সঙ্গে বলেছিলেন নিজেদের রক্ত দিয়ে একজন পেশেন্ট বাঁচানোর স্মৃতিটা তোমাদের মনে গেঁথে থাকবে। যখন সার্ভিসে যাবে দেখবে ভেতর থেকেই একটা আর্জ আসছে, সিনসিয়ারলি কাজটা করার। প্রাণ দিতে পারি না আমরা। কিন্তু প্রাণটাকে আগলে রাখার চেষ্টা করাটাই ডাক্তারি। জুনিয়ার ডাক্তাররা প্রায় সকলেই রাজি হয়েছিল এবং ওদের একজনকে ভার দেওয়া হয়েছিল একটা সিডিউল করার। কে কবে ডোনেট করবে এবং পরিবর্তে ব্লাড বা প্লাজমা নিয়ে আসবে।

স্টুডেন্টদের বললেন—খুব খুশি হয়েছি। তোমরা তোমাদের কমিটমেন্টটা রেখো। তোমরা পড়েছ বোনম্যারো কীভাবে রক্ত তৈরি করে এবং যে রক্তটা ডোনেট করছ সেটা তৈরি হতে তিন-চার দিনের বেশি লাগে না। আমার এখন পাঁচ-ছ'জন হলেই চলবে।

অংশুমান একটু পুতুপুতু আদুরে আদুরে ছ'জনকে বেছে নিলেন। প্রধান উদ্দেশ্যটা ছিল এদের মন থেকে ভয় তাড়ানো। একবার ব্লাড ডোনেট করলেই ভয় কেটে যায়।

সায়িদার ডায়ালিসিস চলছিল একদিন অন্তর। প্লাজমাও দিতে হচ্ছিল। বাচ্চাটা হাত-পা ছুড়ছিল। বাচ্চাকে মায়ের দুধও কিছুটা খাওয়ানো হচ্ছিল। বাচ্চাটাকে কিছুদিন আগেই জন্ম নিতে হয়েছিল বলে ওজন কিছুটা কম ছিল। এবং কিছু কিছু অন্য ধরনের সাবধানতাও নিতে হয়েছিল। যে নার্সরা প্রায় সময় বড্ড খ্যাচখ্যাচ করে, ওরা কেমন যেন হয়ে উঠল। মানবতাও ইনফেকটেড হয়। ভালো কিছু শুরু হলে সংক্রামিত হতে পারে। শুরু করাটাই আসল।

ছাত্র এবং ডাক্তাররাও রক্ত দিচ্ছে শুনে লতিফ-শাকুরের গাঁয়ের লোকজন সব অবাক। এ কী কাণ্ড! এমন হয় নাকি? একজন আধা আলেম বলল তবে তো কেয়ামত আসতে ঢের বাকি। কেয়ামতের আলামত যা যা দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে তো এটা মানায় না। লতিফের বাবা বলল—এজন্যই মানুষকে বলে আশরাফুল মখলুকত। আল্লাপাকের সবচেয়ে বেস্ট সৃষ্টি। মানুষের মধ্যে দিয়েই দয়া নাজিল করেন, তিনি দয়ালু। রহিম। তিনি শাফিক।

লতিফ হুঁ-হাঁ করে।

লতিফের বন্ধুস্থানীয় দু-একজন এই ঘটনা শুনল। লতিফের প্রতিবেশীরাও। আরও ছ-সাত জন বলল, আমরাও রক্ত দেব। ওরাও রক্তদান করে এল।

লতিফের মা কাঁথা সেলাই করছে। গুনগুন গাইছে—'বোরাকে চড়িয়ে রসুল খোদার কাছে যায়। ওরে আমার পরানধন আমার কাছে আয়।' কাঁথার মধ্যে সুতোয় সুতোয় বোরাক আঁকছে, অনেকটা গরুর মতো মুখ, দু-পাশে ডানা। লতিফের বাবা তাঁর সাধের খাতাটা বের করে লিখলেন,

শয়তান সাপের বেশে দিয়েছিল কুমন্ত্রণা
এখনও সেই সাপ দেয় যত যন্ত্রণা।
শয়তান এখনও আছে তৈরি করে ক্ষত।
মানুষ তারও ওপর। আশরাফুল মখলুকত।

সায়িদার ছুটি হয়ে যাবে আর দুদিনেই। ইদের নতুন শাড়িটা পরেছে আজ। একুশ দিনের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। লতিফ সায়িদার বিছানার পাশে, টুলে। দেওয়ালে চুনের কাজ চটে গিয়ে কী একটা নকশা তৈরি হয়েছে, যেন বোরাক, যে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। হাসাপাতালের ছোট আলমারিটা, অক্সিজেনের সিলিন্ডার, প্লাস্টিকের গামলা, সবই যেন কেমন মেঘ থেকে নেমে আসা লাগে।

সায়িদা লতিফের কানের কাছে মুখ রেখে বলল, আমি কিন্তু ছেলের নাম রাখব অংশুমান।

একথা আগেও বলেছিল সায়িদা। লতিফ তখন বলেছিল দেখা যাক। বাড়িতে আলোচনা হয়েছিল। একটা পয়া দিনে হয়েছিল বলে আয়মন রাখার কথা ভেবেছিল লতিফ। কেউ বলল, কত বাধা জয় করেছে ও, তাই নাম রাখো গালিব। লতিফ তখন বলেছিল সায়িদা'র ইচ্ছা ডাক্তারবাবুর নামে ছেলের নাম রাখবে। ডাক্তারের নাম অংশুমান।

লতিফের বাবা মাথা নাড়লেন। এমন নাম হয় না। বললেন, ডাক্তারবাবু খুব ভালো। ওর নাম আমরা মনে রাখব। ওর নামে একটা কবিতাও লিখব। কিন্তু ওর'ম নাম তো আমার নাতির হতি পারে না। মইনউদ্দিন হতি পারে। অংশুমানের 'মান' আওয়াজটা 'মইন'-এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

লতিফের খুব একটা পছন্দ হল না। কিন্তু বাবার কথা তো শুনতেই হবে। লতিফ জেনেছে অংশু মানে চাঁদ। অংশুমান মানে চাঁদ যার গায়ে লেগে থাকে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদ দিয়ে কোনও নাম হয় না? উনি বললেন—খুব ভালো হয়। 'কোমার' মানে চাঁদ, 'হেলাল' হল চাঁদের ফালি। 'বদর' মানে পূর্ণচন্দ্র। বদরউদ্দিন রাখা যেতে পারে।

লতিফ একথা বলেছিল সায়িদাকে। সায়িদা আস্তে করে বলল, তোমরা যা খুশি ডাকো। আমি আমার সোনাবাবারে অংশুই ডাকব।

যেদিন ছুটি হবে, সেদিন গাড়ি ভাড়া করা হল। বাবা-মাও গেল হাসপাতাল। শাকুর যায়নি। একদিনের রোজ কামাই মানে অনেক লস।

লতিফের বাবা গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে, কখনও বসার জায়গাটা কাঁপিয়ে গদি উপভোগ করছিল। গাড়ি-টাড়ি তো চাপা হয় না। পরিচিত মাঠ-ঘাট গাড়ির কাচের ভিতর দিয়ে অচেনা-অচেনা লাগছে। বাসে চাপলে এমন হয় না তো।

জানলার কাচে দু-চার ফোটা, যেন মুক্তো। ভিতর দিয়ে দেখা যায় মেঘলা দুনিয়ার সবুজ। কলাগাছগুলো, বাবলাগাছগুলো, রাস্তার ধারের কচুগাছগুলোও কী সুন্দর। আল্লাপাক সব সাজায়ে রেখেছে যেন। সুন্দর সরে সরে যায়। সুন্দরের ওপরে লেগেছে জীবন। আহা জীবন!

লতিফ বলল—জানেন আব্বাজান, প্লাজমা নামে একটা বস্তু আছে, পলিথিনের প্যাকিটে থাকে। ওটাই হল রক্তের আসল জিনিস। লাল নয় মোটে, কাঁচা কুমড়োর মতো রং। কী করে বানায় জানেন, মানুষেরা রক্ত দেয়, বেচে না, এমনিই দেয়। কখন কার লাগে সেই ভেবে দেয়। রক্ত পরীক্ষে করে বাগদি, বাউন, মোসলমান, ইহুদি, নাসারা কিছু বোঝা যায় না, শুধু গুরুপ বোঝা যায়। তোমাদের ঘরের বউ-এর গুরুপের নাম 'ও'। এ আছে, বি আছে...এইসব কত শুনলাম, কত জানলাম। ওকে সেই গুরুপের রক্তই দেওয়া হয়েছে। সেই গুরুপে বাউন, বাগদি, মুচি, মোসলমান...। ডাক্তাররাও রক্ত দিয়েছে...।

লতিফের বাবা বললে—আল হামদুলিল্লাহ। মানে সবই ঈশ্বরের মহিমা।

কতকগুলো কাক উড়ছিল।

লতিফের বাবা বললে—আজ বড় ভালো দিন। এই দিনে কাককেও মনে হয় আবাবিল। এই পাখি সুসংবাদ বয়ে আনে। আরবে রসুলের কাছে এই পাখি যুদ্ধজয়ের খবর বয়ে নে' গেছিল।

এবার চায়ের দোকানের সামনে চা খাবার জন্য একটু থামা হল।

শিঙাড়াও ভাজছে।

খবর কাগজখানা রয়েছে বেঞ্চিতে।

এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে এক ধর্মস্থানে ঈশ্বরের নামে স্লোগান দিতে দিতে চল্লিশজনকে হত্যা করেছে আত্মঘাতী জেহাদি।

রক্ত-মাখামাখি কয়েকটা মৃতদেহ। ছবিতে রক্তের রং কালো। উচ্চবর্ণের পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল বলে নিম্নবর্ণের মানুষের বস্তিতে গিয়ে গুলি। চারজন মৃত। রক্তমাখামাখি মৃতদেহ। ছবিতে রক্তের রং কালো।

থার্মোকলের সাদা পাত্রে শিঙাড়া।

আকাশে পাখি।

কাক, শকুন, নাকি আবাবিল পাখি?

সমাপ্ত